কোকিল ডেকেছিল

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই মাঘ,
১৮৬৮ শকাব্দ

৩'২৫
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা:
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা,
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্নেহভাজনেষু

ব. ভ. ম.

কোকিল ডেকেছিল

রোজকার মতো সকালে পড়তে এসে নিখিল দেখল একটি চৌদ্দ পনরো বছরের মেয়ে সেকেণ্ডমাস্টার অভয়পদ বাবুর গা ঘেঁষে একটু হেলান দিয়ে বসে গল্প করছে। নিখিলকে দরজার কাছে দেখেই উঠে পড়তে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি, অভয়পদ ডান হাতটা চেপে ধরে বললেন—"উঠতে হবে না, বোস।" নিখিলের দিকে চেয়ে বললেন—"এই মেয়েটির সম্বন্ধেই তোমায় একবার বলেছিলুম নিখিল—মনে আছে নিশ্চয় ?"

কে কবে কোন্ মেয়ের কথা বলেছে—বিশেষ ক'রে সেকেণ্ড-মাস্টারের মত কড়া লোক—সে কথা না মনে রাখাই নিশ্চয় ভালোছেলের লক্ষণ, নিখিল চোখদুটি উপরে তুলল।

"মনে পড়ছে না ? এ হচ্ছে নিভা, আমার ভাগনী, কাল ওর বাপ নিয়ে এল।"

"ও।—বাপ ?" অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্নটা করে চেয়ে রইল।

"হ্যাঁ, আমার ভগিনীপতি হেমন্ত, বোস'না তুমি। না, না, চেয়ারে কেন ? এইখানেই বোস মাদুরে। পড়বে তো—এই দ্যাখো, তুমিও এত লজ্জা করলে কি করতে আনানো ওকে এখানে ? বলেছি তোমায় ওর কথা, ভুলে গেছ। নিভা হচ্ছে এক নম্বরের লাজুক। ওদের সেখানে মেয়েদের আলাদা স্কুল নেই তো—মিড্‌ল্ স্কুলও নয়, ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই পড়ে। মাসের মধ্যে যদি পাঁচ দিন গেল তো পঁচিশ দিন গেলই না। ঐ যে ছেলেদের সঙ্গে এক রুমে বসতে হবে—মেয়েদের আলাদাই বেঞ্চ, কিন্তু তাতে কি হয় ?—"

মুঠার মধ্যে হাতটা গরম হয়ে উঠেছে নিভার, ফিরে দেখলেন মুখটাও একেবারে সিঁদুরবর্ণ, হেসে মুঠা আলগা করে দিয়ে বললেন—"আচ্ছা যা, কিন্তু এ চলবে না বলে দিলুম।"

চলে গেলে নিখিলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—"বাঁচল।"

বাঁচল নিখিলও, এতক্ষণ পরে সহজভাবে একটু হেসে বলতে পারল—"ভীষণ লাজুক দেখছি।"

"ভীষণ—সে তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। ঐ যে বললুম, মাসের মধ্যে পাঁচটা দিন স্কুলে গেল তো বলতে হবে খুব গেল। কিন্তু খুব শার্প মেয়ে তো—হ্যাঁ, আশ্চর্য রকম বুদ্ধিমতী, একরকম বলতে গেলে বাড়িতে পড়ে পড়েই পরীক্ষা দিয়ে একটা স্কলারশিপ নিলে!"

"তাই না কি?" বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করল নিখিল, অভিমতও দিতে পারল—"কিন্তু দেখে তেমন বোঝা যায় না তো?"

"একসেপ্‌শেনালি শার্প। তুমি ভালো ক'রে দ্যাখোনি বলে বুঝতে পারনি। ভাসা-ভাসা চোখে আবার একটু বোকা-বোকাই দেখায় তো, কিন্তু একটু করে লক্ষ্য করে দেখলেই দেখবে মাঝে মাঝে একটা ফ্ল্যাশ (Flash), বুদ্ধি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিন্তু কাল্‌ হোল ঐ লজ্জা—যার জন্যে স্কলারশিপটা আর নেওয়াই হোল না—"

"ব্যাটাছেলেদের দেওয়া ব'লে?"

হেসে উঠলেন অভয়পদ, বললেন—"আরে না, অতটা কি হয় একেবারে যে ব্যাটাছেলের দেওয়া স্কলারশিপেও লজ্জা? শুনলে তো, সেখানে মেয়েদের পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। স্কলারশিপ অ্যাভেল (Avail) করতে হলে তো হাই স্কুল ভিন্ন গতি নেই, কিন্তু যে মেয়ে মিডল্‌ স্কুলেই মাসে পাঁচটা দিন হাজিরা দিয়েছে কি না দিয়েছে, সে হাই স্কুলের চৌকাঠ মাড়াবে? আর সেখানে অত ঢিলেপনা চলবেও না তো, স্কলারশিপটা মাঠে মারা গেল। বাপ ঠিক করেছিল—বাড়িতে পড়িয়েই ম্যাট্রিক পর্যন্ত নিয়ে যাবে, কিন্তু তার সময় কোথায়? ডেলীপ্যাসেঞ্জারী করে চাকরি, সকালে বেরোয় সন্ধ্যায় ফেরে, রাত্তিরে ঐটুকু যা সময়—নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মেয়েটা—আমি খেঁচকে খেঁচকে হয়রান হচ্ছি, বছর ঘুরে গেল কোন ফলই হচ্ছে না, শেষকালে এই সেদিন ওর ছোট ভাইয়ের

অন্নপ্রাশনে গিয়ে চেপে ধরলুম হেমন্ত আর মালতীকে—না আমার ওখানে পাঠিয়ে দাও, আমার স্কুলে ভর্তি করে দিই।"

"কিন্তু এও তো হাইস্কুল স্যার—"

কেন যে অমন হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়ে বলল কথাটা, নিখিল নিজেই ঠিক বুঝতে পারল না। একটু বিস্মিত হয়েই থেমে গিয়ে অভয়পদ প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু সেজন্যে তোমার অত অস্বস্তি যে?"

সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে উঠে বললেন—"ও! বুঝেছি। স্কলার, সে না জানি কত বড় একটা বাঘা-ভাল্লুক। আমাদের ক্লাসের নৃপেনকে তাই মনে হোত। কিন্তু এতো তোমাদের ক্লাসে ভর্তি হচ্ছে না। অবশ্য, নিয়ে নেওয়া যেত। সার্টিফিকেট ধরে পারা যায়। কিন্তু ঐ যে একটা বছর বসে রইল, আমি ওটা বাদ দিয়ে দিতেই চাই, কাঁচাই হয়ে থাকবে তো। তার চেয়ে বরং বাদই থাক না একটা ক্লাস, মেয়েছেলেই তো। তাড়াহুড়ো কিসের এমন? এরপর তোমার প্রশ্ন রইল—তা ছেলেদের হাইস্কুলে কেন? তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ঐ রকম—কি যে বলে—"

"লাজুক। আমি ঠিক করেছি কবিরাজী ধরব এবার।"

"লজ্জার কোন কবিরাজী ওষুধ স্যার—"

"না, না, বড়ি অনুপান নয়। কবিরাজী প্রিন্‌সিপ্লে (Principle-এ) চিকিৎসা ধরতে হবে এবার—বিষস্য বিষমৌষধি। ছেলেরা হোল তোমার বিষ, তাদের দেখলেই যত তোমার ভয় আর লজ্জা, সেই ছেলেদের সঙ্গেই তোমায় এক করে দিচ্ছি দাঁড়াও। বাড়িতে ছেলে, স্কুলে ছেলে, সেখানে যেতে ছেলে, সেখান থেকে আসতে ছেলে, উঠতে ছেলে, বসতে ছেলে—একদণ্ড ছেলে ছাড়া থাকবে তবে তো ছেলেদের লজ্জা আর ভয়। বুঝেছ চিকিৎসাটা এবার?"

হাঁ করে বিমূঢ়ের মতো শুনছিল নিখিল, প্রশ্নটায় সম্বিত ফিরে পেয়ে আমতা-আমতা করে উত্তর দিল—"আজ্ঞে না—মানে হ্যাঁ স্যার বুঝেছি।"

"কি বুঝলে ?"

"মানে—মানে স্যার—একটা মেয়েকে যদি—একটা মেয়েকে যদি—"

"ঠিক বোঝনি, অন্যমনস্ক ছিলে। একটু মন দিয়ে শোন, তুমিই হচ্ছ এর মধ্যে আসল। দু'বেলা পড়তে আস তো ? ও-ও তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে পড়বে, সাইড-বাই-সাইড (Side by side), তুমি চেয়ারে ও মাদুরে নয়। আমি রইলুম সামনে, যেমন তোমায় পড়াই। এর পর তুমি বাড়ি চলে গেলে, ও-ও খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে রইল, যাওয়ার সময়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে, ফেরবার সময় আবার পোঁছে দিয়ে গেলে। কেমন, ঠিক ওষুধ নয় ? তোমার একটু ঘুর পড়বে, কিন্তু এ না করলে স্রেফ্ লজ্জার জন্যে একটা এমন ব্রিলিয়েণ্ট (Brilliant) মেয়ের ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। আজকালকার যুগে একটা ভালো মেয়ের কত স্কোপ (Scope) জীবনে, লজ্জার অত প্রশ্রয় দিলে চলে ?"

নিখিল কপালের ঘাম মুছে ফেলে বলল—"না স্যার।"

ব্যবস্থাটা সেইদিন থেকে চালু করে দিলেন অভয়পদ।

কিন্তু শিবের অসাধ্য রোগ, অভয়পদ কি করবেন ? সবই প্ল্যান অনুযায়ী হয়ে যেতে লাগল, বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত, কিন্তু তার মধ্যে লজ্জাটাকে নির্বাসিত করে একটা সহজ সপ্রতিভ ভাব কোনমতেই আনা যাচ্ছে না যেন। পাড়াগাঁয়ের স্কুল, ক্লাসে মাত্র দুটি মেয়ে, ও আর নিখিলেরই এক জ্ঞাতি-ভাগিনী শীলা। দুজনে ক্লাসের একদিকে পাশাপাশি ডেস্কের সামনে বসে থাকে। শীলা মেয়েটি একটু চপল, তায় গাঁয়েরই মেয়ে, চপলতাকে সংযত করলেও একেবারে মৌন হয়ে বসে থাকতে পারে না। নিভা তার পাশে নীরব হয়েই থাকে এক রকম ; প্রশ্ন নেই মুখে কোন, প্রশ্ন হলে অবশ্য উত্তর আছে, তবে প্রায় অর্ধোচ্চারিত। শিক্ষকেরা বেশী লজ্জায় ফেলতেও চান না ওকে।

করুণা উদ্রেকই করে ; তা ভিন্ন উত্তর তো একেবারে নিক্তি ধ'রে নির্ভুল আর নিক্তি ধরে যথাযথ হবেই ! নিতান্ত প্রয়োজন হোল তো যে প্রশ্নের উত্তর ক্লাসের আর কারুর দ্বারা হোল না, সেটা এগুতে এগুতে নিভার কাছে গিয়ে পৌঁছাল। উত্তরটা দিয়ে দিতে কিন্তু আর সবার মাথাটা যতটা হেঁট হোল, তার চেয়ে নিভার মাথা আরও বেশী করে গেল ঝুঁকে।

শুধু শীলার দৃষ্টি পরাভূত ছেলেদের বেঞ্চ ঘুরে এসে ওর ঠোঁটের এক কোণে বাঁকা ছুরির মতো একটি হাসি উঠে মিলিয়ে গেল। ওই জাতি আর বন্ধুর কৃতিত্বটা মাঠে মারা যেত দিল না।

শুধু চপলতা নয়, মেয়েটির আরও এই রকম ছোটখাটো কতকগুলো দোষ আছে।

স্কুলে এই করে চলল।

পথের ইতিহাস গোড়ার প্ল্যান থেকে একটু অন্য রকম হোল। দুটো দিন প্ল্যান অনুযায়ীই যাওয়ার পর তৃতীয়দিনে হঠাৎ শীলা এসে উপস্থিত হোল বাড়িতে। অভয়পদ সেকেণ্ডমাস্টার হিসেবে স্কুলের দৈনিক পরিচালনার অনেকগুলি বিষয়ের চার্জে, তাঁকে আগেই চলে যেতে হয়, শীলা এল উনি চলে যাওয়ার একটু পরেই। এল কোন একটা প্ল্যান অনুযায়ীই আর তার উদ্দেশ্যটা হয়তো শীলাই জানে। নিভা যেন একটু আগে থাকতেই তোয়ের ছিল, ও আসতে বই খাতাগুলো টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বেরুতে যাবে, শীলা বলল, "বোস, এত আগে স্কুল ঝাঁট দিতে যাবে নাকি ? তা ভিন্ন আমি একটু হাঁপিয়েও গেছি—একেবারে উজিয়ে একটু আসতে হয় তো।"

হাঁপাচ্ছিল সে, একটু বিশ্রাম করে নিল।

বেশী দেরি হয়নি নিখিলের আসতে ; শীলা চেয়ারে বসে মিনিট কয়েকও বিশ্রাম করতে না করতেই সে উপস্থিত হোল ব্যবস্থা মতো। শীলাকে দেখে একটু চিন্তিত হয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে, শীলা ওকে কিছু

না বলে নিভাকে বলল—"চল এবার যাই, ওকে না হয় আমিই নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে আজ নিখিলদা ?"

আর কিছু না বলে অল্প একটু হাসির সঙ্গে ওর সেই বাঁকা ছুরিটুকু খাপ থেকে একটু যেন বের করেই আবার লুকিয়ে ফেলল। তারপর নিভার হাতটা ধরে বেরিয়ে গেল।

দিয়েও গেল সঙ্গে করে ওই।

একেবারে সপ্তাহখানেকের পরে গিয়ে ব্যাপারটা হঠাৎ টের পেয়ে গেলেন অভয়পদ। প্ল্যানের ব্যতিক্রম, তায় শীলার বাড়িটাও একেবারে উল্টা দিকে, স্কুলের সামনে দিয়েই এসে নিয়ে যেতে হয়, আবার ফিরে যেতে হয়, পূর্ব ব্যবস্থাই চালু করতে যাচ্ছিলেন, নিখিলই কাতর প্রার্থনা জানাল—"থাকতে দিন স্যার এই। শীলাই এসে নিয়ে যাক না।"

"কেন বলো তো ?" চিন্তিতভাবেই প্রশ্ন করলেন অভয়পদ।"

"মানে—কথা আর কিছু নয়—বড্ড লাজুক, পা টেনে টেনে চলে—দুদিন দেরিই হয়ে গিয়েছিল স্কুল পৌঁছুতে।"

একটু ভাবলেন অভয়পদ, বললেন—"তা বেশ। কিন্তু ঠিক একটি মাস। পথ চলাটা একটু সড়গড় হয়ে যাক। কিন্তু ঠিক একটি মাস ; আজ হোল কোন্ তারিখ ?"

*

সে এক মাসের পর আরও কটা মাস কেটে গেছে, পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী নিখিলের সঙ্গেই যাওয়া-আসা করছে নিভা, তবে আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ লজ্জা অপসারণের দিকটা কতদূর সফল হয়েছে বলা যায় না। সেই প্রথম দিনের মতো নিখিল সামনে, নিভা হাত চার পাঁচ দূরে মাথাটা হেঁট করে।

সফল যে হচ্ছেই কিম্বা একদিন হবেই, এটা ধরে নিয়ে অভয়পদ নিশ্চিন্তই আছেন, তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হতে

নিখিলকে প্রশ্ন করে বসলেন, "কি রকম বুঝছ? একটু ফ্রি (Free) হয়েছে বলে মনে হয়?"

"কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না, স্যার।" উত্তর করল নিখিল।

"এই যে এতটা পথ যাওয়া-আসা কর একসঙ্গে, কোন কথা হয় না?"

"না স্যার।"

"মুখ বুজে থাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার কারণ—তুমিও নিশ্চয় মুখ বুঝে থাক। ও মেয়েছেলে গায়ে পড়ে কথা কইবে সেটাও তো ঠিক নয়, বেহায়াপনাই হবে সেটা। চেষ্টা করবে ওকে কথায় টানবার। করনি কখনও চেষ্টা? যেমন ধরো স্কুলটা কেমন লাগছে, পড়াশোনা হচ্ছে কেমন? কিম্বা কোন সাবজেক্ট্ নিয়েই আলোচনা করতে করতে এলে তুজনে।"

করেছিল একবার নিখিল একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়ে। ছুটির পর অনেকখানি পর্যন্ত কিছু কিছু ছেলে থেকেই যায় সঙ্গে। শেষ দিকে এসে প্রায় ওরা তুটিতেই থাকে বাকি। যেখানটার তুদিকে শুধু টানা মাঠ। জিগ্যেস করেছিল—"তোমার এই রকম সবুজ ধানের ক্ষেত আর ওপরে নীল আকাশ কেমন লাগে নিভা?"

নিভা সেই রকম হাত কয়েক পিছনে।

মাথা না ঘুরিয়েই প্রশ্নটা করেছিল, উত্তরটা সেইভাবেই শুনল—"ভালো।"

কয়েক পা গিয়ে আবার প্রশ্ন করল—"আর কোকিলের ডাক?"

একটা ছাৎ করে শব্দ হতে ঘুরে ছাখে, হাতের বই খাতা সব পড়ে গেছে, দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে নিভা সেইদিকে। এরপর আর সাহস করেনি নিখিল।

অভয়পদের প্রশ্নের উত্তরে বলল—"না, করিনি চেষ্টা স্যার!"

"করবে। যেমন ধরো স্কুলটা কেমন লাগছে, পড়াশোনা হচ্ছে কেমন, কিম্বা একটা সাবজেক্ট নিয়েই আলোচনা করতে করতে এলে তুজনে। কিম্বা কোন শিক্ষক বা—আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে কিছু বলে তোমায়?—যেমন মামা বড্ড কড়া, কি জেদি, কিম্বা—"

"না স্যার।"

উত্তরটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা হঠাৎ যেন আপনি বের হয়ে গেল নিখিলের মুখ থেকে—"আমার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলে স্যার?"

একটু শংকিত ভাবেই যেন বলল এই রকম মনে হওয়ায় অভয়পদ থেমে গিয়ে একটু কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে হেসে বললেন—"তোমার সম্বন্ধে কি বলবে আমায়? গার্জেনী করছ তার নালিশ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। চায় না তো আপনার ব্যবস্থাটা—অথচ এমন সুন্দর ব্যবস্থা—"

একটু হাসবার চেষ্টা করেই বলল।

ভেতরকার কথাটা কিন্তু অন্য রকম।—কিছুদিন আগেকার কথা। স্কুলের কাজের চাপ পড়লে, বিশেষ করে ছেলেদের অনুশীলন বা পরীক্ষার খাতা বেশী জমে গেলে অভয়পদকে এদিকে একটু ঢিলে দিতে হয়। এখন নিভা এসে পড়ায় পড়ানোর কাজ আরও বেড়ে গেছে, উনি এরকম অবস্থায় পড়লে তাড়াতাড়ি নিখিলকে খানিকটা দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে ওকেই আবার নিভাকে দেখতে বলে ওপরে চলে যান।

নিখিলের সাহায্য দরকার হয় না নিভার বড় একটা, ক্বচিৎ যদি এক-আধটা প্রশ্ন করল কখনও।

একদিন ভূগোল পড়তে পড়তে ম্যাপে একটা জায়গা দেখিয়ে নেওয়ার জন্যে উঠে এল। অভয়পদ না থাকলে তাঁর বিধান অনুযায়ী সাইড-বাই-সাইড বসবার দরকার হয় না, একটু সরে ওঁর জায়গাতেই বসে।

নিখিল একটা অঙ্ক কষছিল, সামলাতে পাচ্ছিল না, বলল, "থামো দিচ্ছি দেখিয়ে।"

দেরি হতে লাগল। নিভা হাতে ভর দিয়ে ওর অঙ্ক কষা দেখছিল, বলল, "আমি করে দিই? আপনার এইখান থেকে ভুল হয়ে গেছে একটু।"

একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। অঙ্কেতে খুব পোক্ত, খুব একটা আগ্রহ থাকে।

নিখিল 'হ্যাঁ না' কিছুই না বলে যেখান থেকে ভুল হয়েছে সেখানটায় একদৃষ্টে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর যেন নিভার আগের কথা ভুলে গিয়েছিল এইভাবে হঠাৎ ঘাড়টা তুলে বলল, "কি দেখিয়ে দিতে বলছ?"

নিভা ম্যাপের কথাটা বলল আবার।

নিখিল বলল, "দাঁড়াও দেখি। সব ম্যাপে আবাব এসব ছোট-খাটো জায়গা দেয় না।"

খুব ঝুঁকে দেখতে লাগল। নিভাও স্বাভাবিক আগ্রহবশেই অঙ্কটা আরম্ভ করে দিয়েছিল, নিখিল আড়চোখে যখন দেখল তখন অঙ্ক শেষ করে পেন্সিলটা রেখে দিয়েছে। ম্যাপে তর্জনীটা টিপে ধরে বলল, "এই তো।"

একটু যেন বিদ্রূপের সুরেই বলল—"কোথায় খুঁজেছিলে তুমি?" তারপর কলমটা তুলে নিয়ে নিজের খাতার দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"অঙ্কটা কে কষে ফেললে?"

"আমি"—কতকটা অপরাধীর মতোই স্তিমিত কণ্ঠে উত্তর করল নিভা।

"কেন, আমি বুঝি পারতুম না?"—একটু যেন বিরক্তির সহিতই কথাটা ব'লে নিখিল অন্য অঙ্কটায় হাত দিল। এটা আরও গোড়ার দিকে ভুল থেকে যাওয়ায় এগুতে পারছিল না, ক্রমাগতই কাটাকুটি করছিল, একবার চোখ তুলে দেখল নিভা এইদিকে দৃষ্টি ফেলে বসে

আছে। কান দু'টো হঠাৎ গরম হয়ে উঠল নিখিলের। আবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও বেশি কাটাকুটি হওয়ায় কান আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় কলমটা খাতায় রেখে দিয়ে বলল—"এটা ছাখো তো একবার। এক ছাই এসে (Essay) লিখতে দিয়েছেন হেডমাস্টার, কোন মতেই এদিকে মন দিতে পারছি না।"

নিভা খাতাটা টেনে নিয়ে টকটক ক'রে অঙ্কটা কষে ফেলছিল, নিখিল বাধা দিয়ে বলল—"দাও, ও খাতাটায় নয়। কাটাকুটি ক'রে নোংরা করে ফেলবে। তুমি বরং পেন্সিলে এই রাফ (Rough) খাতাটায় করে ফেল।"

দেরি হোল না। খাতাটা ফিরে এলে দেখে নিয়ে বলল—"হুঁ, ঠিক হয়েছে।" একটু ভাবল, তারপর বলল—"তুমি বরং এক কাজ করো তাহলে, তোমার দিকে দেখতে গিয়ে আমার দেরি হয়ে গেল। অঙ্কগুলো কষে ফেল রাফ কপিতে। ফেয়ার (Fair) করে নোব'খন ভুল থাকলে ঠিক করে নিয়ে। আমি বরং ততক্ষণ প্রবন্ধটা লিখে ফেলি।"

অঙ্কগুলা যখন শেষ হোল, তখন প্রবন্ধের আধখানা পাতাও শেষ হয়নি নিখিলের। আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছিলই নিভা, পেন্সিলসুদ্ধ খাতাটা এগিয়ে দিতে বলল—"হয়ে গেল? তোমার অঙ্কটা বোধ হয় ভালো লাগে, না?"

মাথা দোলাল নিভা।

নিখিল মুখটা বিকৃত করে বলল—"আমার মোটেই ভালো লাগে না। আর এসব অঙ্ক কোন কাজেও তো লাগে না জীবনে! লাগে?"

নিভা মাথা নেড়ে জানাল—না লাগে না।

"তাহলে তুমি এক কাজ করো। প্রবন্ধটা ততক্ষণ রাফ কপিটায় লিখে ফেল। 'সাধুতা' এই যে আমি খানিকটা লিখে রেখেছি। আমি ততক্ষণ অঙ্ক ক'টা টুকে ফেলি। নিজের কাজের উপর আবার তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে গেলে এত দেরি হয়ে যায়!"

নিভা বলল—"অঙ্কগুলোর আর একটা সহজ প্রসেস (Process) আছে, শীগ্‌গির হয়ে যায়।"

"সে আবার কি রকম? দেখি তো ঠিক কি না।"

তারপর বলল—"থাক, অন্যদিন দেখব'খন। তুমি লিখে ফেল প্রবন্ধটা।"

স্থুরু এই। তারপর এই চলছে। খুব কম দিনই নিজে অঙ্ক করে। নিভা রাত্তিরে কষে রেখে সকালে খাতাটা ওর খাতার ভেতর ভাঁজ করে রাখে, নিখিল সুযোগ বুঝে টুকে নেয়। প্রবন্ধও প্রায় সব নিভারই।

তবে ফাঁকি দিতে দিতেও কিছু এগুচ্ছে সাহচর্যগুণে। আবার এদিকে পরীক্ষাও আছে, সাপ্তাহিক অনুশীলন আছে। সহজ প্রসেসগুলো শিখে নিতে হয়; নিভার প্রবন্ধগুলোও মুখস্থ করে নিতে হয়। একসঙ্গে থাকতে অন্তরঙ্গতা হচ্ছে, ফাঁকির সঙ্গিনী করে নেওয়ার জন্য, বুঝে নিতে, কি ওর প্রবন্ধ আয়ত্ত করে নিতে আর বাধে না।

আর এত প্রভেদও নেই তো, মোটে এক ক্লাশ নীচের ছাত্রী। সার্টিফিকেট ধরে দেখতে গেলে, সে প্রভেদটাও থাকে না। শুধু ভয় করে সেকেণ্ডমাস্টার অভয়পদকে। এসব কথা কিছু তার কানে পৌঁছায় না তো—তাই প্রশ্নটা।

তিনটা বছর কেটে গেল। দ্বিতীয় বৎসরে নিখিল পাস করে বেরিয়ে জেলা-শহরে গিয়ে ভর্তি হোল। পরের বছর নিভাও স্কলারশিপ নিয়ে স্কুল ছেড়ে বেরুল। অভয়পদ কলকাতার একটা মেয়েদের কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। হস্টেলে থেকে পড়বে।

এরপর আরও চার বৎসর কেটে গেছে। সময়টা দীর্ঘ, কিন্তু তার মধ্যে যে-সব ঘটনার এ কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সেগুলির সংক্ষেপেই উল্লেখ করা যায়।

নিখিলের পিতা মারা গেলেন। ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়তে যাচ্ছিল নিখিল, আর গেল না। পড়াশোনার দিকে কোন কালেই আগ্রহ ছিল না, তার ওপর নূতন আইনের কবল থেকে জমিদারীর কতটুকু রক্ষা করা যায় দেখতে হবে তো,—খুব হিসাবী আর কড়া প্রিন্সিপালের মানুষ হয়ে উঠেছে। এখন ঐ স্কুলেরই সেক্রেটারি ও।

নিভা ভালো করেই আই-এ, বি-এ পাশ করে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে শোনা যায়। বার চারেক এসেছিল এই ক'বছরে, তার মধ্যে শেষের দিকে তুবার নিখিলের বাড়িতেও এসেছিল। নিখিল জমিজমার ব্যাপারে জেলা-শহরে বেরিয়ে গিয়েছিল মকদ্দমার তদ্বিরে ; দেখা হয় নি।

অভয়পদ হেডমাস্টার হয়ে দূরে একটা স্কুলে চলে গিয়েছিলেন। একেবারে শেষের খবর, আবার এই স্কুলেই হেডমাস্টার হয়ে ফিরে এসেছেন।

ওঁকেই একটা অনুষ্ঠান করে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে বাড়ি ফিরছে নিখিল, গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ির শেষধাপে উঠেছে, একটি মেয়ে যেন অপেক্ষাই করছিল, যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে বলল— "আসুন। দেরি করে ফেললেন।"

একেবারে হকচকিয়ে গেল নিখিল। মেয়েটির বয়স একুশ-বাইশ হবে, সাজগোজ বেশ ছিমছাম, এদিকে একটু দীর্ঘাঙ্গী আর দাঁড়াবার ভঙ্গিটা সিধা আর অচেনার হিসাবে অতিরিক্ত যেন সপ্রতিভ। নিখিল একটু চেয়ে থেকে বলল—"কিন্তু—চিনতে পারছি না তো, দেখেছি কি কোথাও আপনাকে ?"

"আগে নিশ্চয় দেখেন নি, নয়তো মনে থাকত নিশ্চয়। কিন্তু এই একটু আগে যে ভাল করে দেখলেন এ কথা শপথ করে বলতে পারি। অবিশ্যি আমিও আপনাকে দেখছিলুম—নয়তো জানব কি করে ?"

নিখিল মুখে একটু অপ্রতিভের হাসি ফুটিয়ে তুলেছে, শীলা এসে উপস্থিত হোল, ওর কোলে এখন এক শিশুকন্যা। বলল—"নিখিলদা

ও নিভা যে! অবশ্য তোমার দোষ দিই না, কী বদ্‌লে গেছে পোড়ারমুখী! আমারই ধোঁকা লেগে গিয়েছিল। কী রং হয়েছে কোলকাতার নোনাজলে, সে নুয়ে পড়া কোল-কুঁজো ভাবও নেই, আর সেই চুল—জট ছাড়াতে নাজেহাল হোতে হোত—"

"বলোনা, থামলে কেন?"

খিল খিল করে হেসে উঠল নিভা। হাতে একটা সাদা কি ফুলের গুচ্ছ ছিল, খোঁপায় গুঁজে দিয়ে আরও একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—"নাও তোমায় সাহায্য করছি।"

নিখিল একটু অপ্রতিভ ভাবে বলল—"এবার মনে পড়েছে। মাস্টারমশাইয়ের ফাংশানে (Function-এ) ঐ ফুলটা চোখে পড়েছিল বটে মেয়েদের ওদিকে—"

একেবারে ডুকরে হেসে উঠল নিভা। বলল—"একবার সাফাই গাওয়াটা দেখ শীলা মানুষটির! ঠায় একদৃষ্টে দেখছিলেন আমায়—যখনই চোখ ফিরিয়ে দেখি ঠায় চেয়ে আছেন। এখন বলেন কিনা—শুধু ফুলটা চোখে পড়েছিল!"

শীলা বোধ হয় ভাইয়ের হতভম্ব ভাব দেখে বলল—"নে, ভেতরে আয়, দাঁড়িয়ে রয়েছেন দাদা—দেখবার মত হয়েছিস আজ, দেখেছেন তো ভারি দোষ করেছেন যেন?"

"আজ?"—ঘুরেই ছিল নিভা, আবার দাঁড়িয়ে পড়ল; চোখ দু'টা কপালে তুলে বলল—"আজ বলছিস কি তুই? উনি ভুলেছেন বলে আমি যেন ভুলে বসে আছি। জানিস? বলে দোব নিখিলদা?"

"কি?"—অপ্রতিভ ভাবটা সামলাবার যেন অবসর পাচ্ছে না নিখিল।

"জানিস? স্কুল থেকে বাড়ি যাচ্ছি দু'জনে, আমার সেকালের অভিভাবকটি আর আমি—ঘোষ পুকুরের পরেই ফাঁকা মাঠ তো? অভিভাবক মশাই হঠাৎ জিগেস ক'রে উঠলেন—কোকিলের ডাক তোমার কেমন—"

একেবারে হেসে প্রায় উল্‌টে পড়তে পড়তে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে শীলাকে ঠেলেই ভেতরে চলে গেল।

এ ভাবটা অবশ্য রইল না। না হয় বদলেছেই নিভা, কিন্তু পরিচয়টা তো পুরোনোই, আর ঘনিষ্ঠও, জড়তাটুকু কেটে যেতে দেরি হোল না নিখিলের।

নিভা বলে—"কি করব বলো নিখিলদা?' এই রকমটা দাঁড় করিয়েছে আমায় সবাই মিলে। প্রথমটা তো মামা পথ ধরালেন একগাদা ছেলের মধ্যে জোর করে ফেলে দিয়ে—"

"কিন্তু তাতে তোমার কিছু ইতর বিশেষ তো হয়নি নিভা—"

শীলা আবার নিখিলকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে—"না হয়নি! যা বোঝ না তাতে কথা কইতে যেয়ো না দাদা! কবে কোকিল ডাকের কথা বলেছিলে—তোমার মনে নেই, অথচ ওর মনে গেঁথে—"

"তুই কি করে জানলি মনে নেই?" চোখ পাকিয়ে চাইতে গিয়ে নিজেও হেসে ফেলল নিভা, এরাও যোগ দিল। সুযোগ বুঝে নিখিল ঘুরিয়ে নিল কথাটা, বলল—"থাক; হয়েছে। প্রথম দোষটা মাস্টার মশাইয়ের ওপর দিয়ে গেল, তারপর?"

"ভাবলাম—যাক, এবার নিজেদের কলেজ নিজেদের হোস্টেল, নিশ্চিন্দি। ওমা, একেবারে পাগল করে দেওয়ার উপক্রম! মাথা হেঁট করে থাকি, কম কথা কই, মামার ব্যবস্থার ফল তো উল্টোই হয়েছিল—প্রথমে স্কলার মেয়ে, গুমুরে, বলে টিপ্পন কেটে কেটে অস্থির করে দিলে। দেখলে সেটাও যখন কাটিয়ে উঠছি—আরম্ভ করল—বৌমা, বৌঠাকরুন, ক'নে বৌ, নতুন বৌ—এই করে পিটে পিটে সায়েস্তা করে এনে এখন আবার বলতে আরম্ভ করেছে—আলট্রা-মডার্ণ (Ultra modern), আলট্রা স্মার্ট (Smart) এমন কি পেছনে ফ্লার্ট (Flirt) পর্যন্ত বলতে ছাড়ে না। কোন্ দিকে যাই বলো।"

শীলা বলল—"তুই ওদিক ছেড়ে এইদিকে চলে আয় এবার। আমার কথা—"

থেমে গেল। এবারের চোখ পাকানোর মধ্যে হাসি নেই নিভার

এই হচ্ছে। যত হাসি-তামাসা এইখানে এসে যাচ্ছে শেষ হয়ে। যত তরলতা এইখানে এসে কাঠিন্যে অচল হয়ে পড়ছে। তবে শীলা হাল ছাড়েনি। নিখিল বলে —"সে কি রকম করে হবে? ও শিক্ষিতা—অবশ্য কম-বেশী করে আজকাল সব মেয়েই, কিন্তু ও একেবারে বি-এ, তাও সাধারণ একটা বি-এ নয়; এম-এও দিতে যাচ্ছে।"

"তুমি না চাও তো রোখা যায়"—শীলা বলে।

"রোখবার প্রশ্ন ওঠে কি করে? অন্যায় করেছে বা করছে একথা তো বলছি না। তবে আমি তো সামান্য একটা ম্যাট্রিক—কলেজ মাড়াবার না আছে আর ইচ্ছে, না আছে সুযোগ।"

"এ তোমার অভিমানের কথা, না হয় হিংসে।"

"দুটোর একটাও নয়। তাহলে আমায় চিনিসনি তুই। ও বিলেতে কিম্বা আমেরিকায় গিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসুক, খরচ দিচ্ছি। না নিতে চায়, চাকরি করে শুধে দেবে। কিন্তু ঐ কথা, অত বিদ্যে নিয়ে চাকরিই করবে তো—কত স্কোপ রয়েছে আজকাল—নিদেন একটা প্রফেসারিও; আমার সংসারে কি কাজ ওর?"

শীলাকে বললে নিভা, একটু হেসেই বললে—"ছাখো কাণ্ড! মাঝখান থেকে এই মেয়েটা ক্ষেপে গেল। একটা আলট্রা-মডার্ণ মেয়ে চাকরি না করে বাড়ি বসে থাকলে আরও জ্বালাই তো।"

আগে এর চেয়ে স্পষ্ট উত্তর ছিল, এখন এই রকম মন বুঝে নেওয়ার মতো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এই ক'রে চলে আসছে।

ছাড়ে না শীলা, ওদিকেও নরম করে আনল, তারপর একদিন দু'জনকেই একসঙ্গে ধরে বসল—"পেটে খিদে, মুখে আপত্তি, এ আমি আর শুনছিনে। ওদিকে মাস্টারমশাই, এদিকে জ্যেঠাইমা দু'জনেই মুখ চেয়ে আছেন—শেষ কথা জানিয়ে দিতে হবে তাঁদের আমায়, স্পষ্ট করে

বলো। তার মানে স্পষ্টাস্পষ্টি রাজি হও। নিভাদি তুমি কত স্মার্ট আজ তার পরীক্ষা।

বাইরের লনে চা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অভয়পদ আর নিখিলের মাও ছিলেন, তুজনেই ভেতরে চলে গেছেন কিছুক্ষণ হোল।

নিখিল বলল—"আমার মত—চাকরি করতে বাইরে যেতে পারবে না।"

"নিভা কি বলিস?"—শীলা ঘুরে প্রশ্ন করল।

"বেশ তো, এইখানেই করব স্কুলে।"—উত্তর করল নিভা।

"বাঃ, এতো আরো সমস্যা!" বিমূঢ়ভাবেই বলল নিখিল।

মুখটা ঘুরিয়ে চেয়ারের পিঠে রেখেছিল নিভা, বলল—"শীলা, জিজ্ঞেস কর, একটা মেয়ে-স্কুল করে দিলে মেটে না সমস্যাটা?"

"সে কথা ঠিক রে শীলা! সত্যি একটা সমস্যা মেটে। স্কুলে মেয়েও বড্ড বেড়েছে এদিকে।"—একটা যেন নূতন আলো দেখতে পেয়ে বেশ উৎসাহভরেই বলে উঠল নিখিল। আরাম-কেদারাটায় সোজা হয়ে উঠে বসেছে উৎসাহের মুখেই।

উঠে পড়েছে নিভা। হাসি লুকুতে তু'হাতে নিজের গাল তুটো চেপে ধরেছে, তারই মধ্যে বলল—"বলে দে শীলা, স্কলার ঘরে এলে এরকম অনেক তুচ্ছ সমস্যা আপনি যাবে মিটে।...বাবাঃ! কি স্মার্টই হোতে হোল পোড়ারমুখীর পাল্লায় পড়ে!"

ছুটে গিয়ে গাড়ীবারান্দায় মোটরের দোর খুলতে খুলতে বলল—"মামাকে আর শফারটাকে ডেকে দিয়ে একটু উপকার করবি, না, শুধু ফিচলেমি করবি বসে বসে?"

নালিশ

আজ মাইনে পাওয়ার দিন। ভগ্নীপতি কি অবস্থায় কারখানা থেকে ফেরে নিজে এসে দেখে যাওয়ার জন্য কালিদাসী তার বড় বোন যশোদাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

হারাধন আজ কাজে বেরুবার জন্য যখন একে একে ঠাকুরদেবতার পটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছে, সেই সময়েই ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছোট দেওর সত্যকে কালিদাসী দিদিকে ডেকে আনবার এই আদেশটা দিল, উদ্দেশ্য নিশ্চয়—বড় শালীর খাতিরে যদি খানিকটা সামলে থাকে আজ। ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। গতবার দু'জনে ধরাধরি ক'রে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল রাত যখন প্রায় বারোটা।

শক্ত মেয়ে কালিদাসীও, নিজের হাতে যা দাওয়াই আছে সে সব প্রয়োগ করছে। মাইনেটা সে নিজের হাতে নিয়ে নেয়, ধারে মাল পাচ্ছিল হারাধন, তার ব্যবস্থাও একরকম হ'য়েছে, নেহাত দু'কান কাটা না হ'লে আর দেবে না বিনোদ সাহা। এখন এই প্রথম দিনটা কেটে গেলে কতকটা এক্তিয়ারের মধ্যে এসে পড়বে আশা করা যায়।

যশোদাকে ডেকে পাঠাবার আর একটা হেতু, বড় বদনাম রটে গেছে কালিদাসীর। দিন দশ আগে ছোট বোনের বিয়েতে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। মা থেকে নিয়ে আত্মীয়স্বজন যারা এসেছিল, তাকেই দুষেছে। কেউ বলেছে, পুরুষমানুষের ওটুকু দোষ থাকবেই; স'য়ে যাওয়াই মেয়েছেলের ধর্ম; কেউ আশ্বাস দিয়েছে, সময়ে আপনি সেরে যাবে এ রোগ; কেউ ভয় দেখিয়েছে, শাসন করতে গেলে উল্টো ফল হবে বরং; নেশা করুক যাই করুক পুরুষের পুরুষালি ব'লে একটা জিনিস আছে তো! তাতে ঘা দিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অবশ্য এসব কথায় কান দেয় না কালিদাসী—যাকে ভুগতে হয়

সেই জানে। ও যে পথ ধ'রে চলেছে, তাইতেই সায়েস্তা ক'রে এনে তবে ক্ষান্ত হবে। তবু মিষ্টি তো লাগে না, বাপের বাড়ি গেলেই গঞ্জনা আর উপদেশের ছড়াছড়ি। এদিকে হারাধন এমন নিরীহ ভালো মানুষটি সেজে যশ নিয়ে আসে সেখান থেকে যে, আরও যেন অসহ্য হয় কালিদাসীর।

তাই ঠিক করেছে, এবারে একজন সাক্ষী রাখবে।

কাজে বেরুবার সময় শুনিয়ে বলার কিছুটা ফল হলো। আজ আর কাউকে নিয়ে আসতে হয়নি হারাধনকে সঙ্গে ক'রে। পা অবশ্য বেশ টলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, ঘাড়ও সিধে নেই, তবে বাড়ি এসে ঢুকলো একাই। দেরিও করেনি। সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে গিয়ে চেরাগ বাতি জ্বালা হয়েছে এমন সময় এসে সদর দরজার চৌকাটটা ধ'রে একটু দাঁড়ালো। বোধ হয় সাহস সঞ্চয় ক'রে নিলো একটু, তারপর না-টলবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে উঠোনের মাঝখানে একবার পড়ো-পড়ো হয়ে বারান্দায় উঠে একটা থাম ধ'রে পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করলো।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। কালিদাসী নিশ্চয় গা ধুতে গেছে। ভালই হোল, উঠোনের ব্যাপারটা তার চোখে পড়লো না। কিন্তু, একি কাণ্ড!...

যে অপরের দোষ ধরে, তার নিজের দোষ দেখতে পেলে যে ক্রোধটা এসে পড়ে, তার সঙ্গে খুশীও থাকে মেশানো। যশোদাদিদিকে ডেকে পাঠিয়ে বাবু নিজে গেছেন গা ধুতে...কিম্বা পাড়া বেড়াতেই চলে যাননি তাই বা কে বলতে পারে।......এদিকে বাড়ি হাট আদুড় একেবারে! · পরকে বলতে তো কিছু লাগে না...

থামটা ছেড়ে দিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বারান্দায় পা বাড়িয়েছে, এমন সময় যা ভয় করা—যশোদাদিদি এসে কাউকে না পেয়ে বোধ হয় বারান্দার আধা অন্ধকারে চৌকির ওপর ব'সেই ছিল, ওর আওয়াজ শুনে উঠে একটু এগিয়ে এলো। একবার মুখটা একটু তোলবার চেষ্টা ক'রে তখনি নামিয়ে নিয়ে হারাধন টলতে টলতে

এগিয়ে গিয়ে "দিদি, গড় করি" বলে পা ছুটোর মাঝখানে মাথা নামিয়ে দিলো। নেশার ঝোঁক আছে তাই সাহস হচ্ছে না মুখ তুলতে। একভাবে পড়েই ছিল, "ওঠো" বলতে মাথাটা মাটি থেকে তুলে চুপ ক'রে একটু ব'সে থেকে মনটাকে সাধ্যমত গুছিয়ে নিলো হারাধন, তারপর "ওফ্ !" করে একটা শব্দ ক'রে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললো, "অভ্যর্থনার ঘটাটুকু একবার দেখে নাও দিদি ! তোমাকে ডেকে নবাব কন্যে··· থুড়ি, ছোট বোন কিনা নিজে গেছেন পাড়ায় টহল দিতে ! এদিকে বাড়ির অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখলে এসে—চোরে এসে গের-স্থালীর তাবৎ জিনিস যদি উঠিয়ে নিয়ে যায় তো একটা বলবার লোক নেই। অথচ বুকের রক্ত দিয়ে একটি একটি ক'রে কী কষ্টে যে···ওফ !"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ হতে লাগলো। সেই সময়টুকুর জন্য একটু চুপচাপ, তারপর আবার একটা পা চেপে ধ'রে আরম্ভ করলো হারাধন—"তুমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই রইলে যে দিদি ! না, বোসো গরীবের ঐ ক্যাওড়া কাঠের তক্তপোশটার ওপর।···হ্যাঁ, এইবার শোনো দিদি, শুনতেই হবে। তুমি শুধু মুখটি বুজে শুনে যাও।···না, না, আমি এই পায়ের কাছে ব'সেই বলবো। আমি কে দিদি ?—তোমার গোলামের গোলাম তস্য গোলাম বৈ তো নয়।···কত যে ছুক্খু, কোথা থেকে যে আরম্ভ করবো, কোন্‌টে যে ছাড়বো, কোন্‌টে যে বলবো কিছুই ঠাহর ক'রে উঠতে পারছি না। এই তুমি নিজেই ছাখো না দিদি—ডেকে পাঠিয়েছে—কী না, ভগ্নীপতিকে স্বচক্ষে দেখবে। তা দেখাবি তো তুই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খুঁটে খুঁটে ব্যাখ্যানা ক'রে ক'রে দেখা—তা সে খ্যামতা তো নেই—নিজে যে মায়ের তুল্যি বড় বোনকে বারান্দায় বসিয়ে রেখে ··ঘরেও নয় দিদি, ওফ্ !···এই বারান্দায় বসিয়ে রেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্, মনে গলদ আছে ব'লেই তো ?···ভগ্নীপতির কী ? নিষ্পাপ নিধম্ম মানুষ, এই তো দিদি পায়ের তলায় বুক ফুলিয়ে ব'সে আছি। মনে গলদের ছিটেফোঁটা থাকলেও কি পারতুম দিদি, তুমিই বলো !···

কাজ শেষ হবার পর মাইনেটি পেতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা চ'লে এসেছি—ডাইনে চাইনি, বাঁয়ে চাইনি—নিজেকে বললুম চল্‌রে হারাণে। আজ তোর দিদি আসছে, পাপের শরীল, পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে শুদ্ধু হবি চল্‌!"

—ব'লেই "ওফ্‌!" ক'রে আবার একটা বুকভাঙ্গা শব্দ ক'রে চুপ করে রইলো একটু।—তারপর আবার—

"কোন্‌টে যে বলি, আর কোন্‌টে না বলি দিদি—সন্দেহোর ওপর কিছু আর বাকি রাখছে না। আরে, তোর সোয়ামী, অগ্নিসাক্ষী ক'রে তোকে নিয়েছিল, একটুখানি মান রাখ্‌ তার।···শুধু একটু মান। একটা কুকুর-বেড়াল পুষলেও তার সঙ্গে একটু ক্ষ্যামা ঘেন্না ক'রে ব্যাভার করে মানুষে—কি বলবো দিদি, পরশু রুদয়াস্ত ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছিল আমায়···"

একটা যেন শিউরে ওঠার শব্দ হলো।

"শিউরে উঠলে দিদি? শিউরে ওঠবার অনেক বাকি আছে এখনও। একটি মিথ্যে কথা নয় দিদি, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, গুরুজন তুমি, মিথ্যে বললে রনন্ত নরক। পরশু হপ্তার ছুটি ছেলো তো! বলে—ছাড়া পেলে আবার তুমি বিনোদ সা'র দোকানে গিযে উঠবে।··রাত্তিরে নাকি বিনোদ সা'র দোকান থেকে যার নাম উচ্চারণ করতে নেই দিদি তোমার সুমুখে, সেই জিনিস গিলে এসেছিলুম। একবার বিচার করো দিদি—কে বিনোদ সা', কোথায় থাকে, কি করে কিচ্ছু জানিনে।···সমস্ত দিনের মধ্যে একবারটি শুদ্দু দরজা খুলে ভাতের থালাটা রেখে দিয়েই আবার চাবি। জেলের কয়েদী বলে আমি পদে আছি।···শিউরো না দিদি, শিউরোবার এখনও ঢের বাকি আছে।"

মাথার চুলটা খাম্‌চে, ঘাড় নীচু ক'রে ব'সে রইলো। তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। শুধু বারদুই দীর্ঘশ্বাস আর বার দুই দুটো "ওফ্‌ ওফ্‌!" শব্দ।

"এই দজ্জাল নিয়ে ঘর করছি দিদি। আমি বলি—"হ্যাঁগো,

তুমি না তারুদাসের মেয়ে, যশোদা-দিদির বোন্? তোমার কিনা নিজের সোয়ামীর সঙ্গে এই আচরণ?…কিন্তু চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী। আচ্ছা তাও যাক্, কপাল মন্দ, সইতেই হবে যদ্দিন এই খাণ্ডারের হাতে পরমায়ুটা আছে—সয়েই যাই, কিন্তু এর ওপর যা ব্যাক্যিযন্ত্রণা দিদি—যেন হলাহল ঢেলে দেয় কলিজার মাঝখানে। বলে—সোয়ামী? এমন সোয়ামীকে ভাগাড়ে……"

আবার একটা শিউরে ওঠার শব্দ হলো।

"দিদি আমার শিউরে শিউরে উঠছেন ছোট ভাইয়ের অবস্থা দেখে। এক তরফাই তো শুনে এসেছো এ্যাদ্দিন। জানি তো বাপের বাড়ি গিয়ে কী কেচ্ছা ছড়ায়, কী সতীলক্ষ্মী সেজে বসে। হারানে শালা তো মুখ খুলতে পায় না! মনে করলুম, আজ সুবিধে ক'রে দিয়েছেন ভগবান, দিদি বাড়ি ব'য়ে আসছেন, তাড়াতাড়ি গিয়ে বুকটা একটু হাল্কা করি। তা, দ্যাখো একবার বিচার ক'রে দিদি, কী-এক জমাদারণী ইস্তিরির পাল্লায় পড়েছি! জমাদার-বৌ শায়েস্তা করতে কি আমিই জানি না? ইচ্ছে করলে না করতে পারি কি? ঐ তো, বেশি দূরেও যেতে হবে না, বস্তির ভেতরেই রয়েছে বেচা-বাউড়ি, যখন খুশি বাড়ী ঢুকছে, য্যাতো রাত ক'রে খুশি, আবার য্যাখন্ খুশি বেরিয়ে যাচ্ছে, বৌ-একবার ট্যাঁ-ফোঁ করুক তো ঘাড়ে কটা মাথা আছে! তা, সে রকম মতিগতি তো দ্যান্নি ভগবান, প'ড়ে মার খেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একদিন যদি ফোঁস ক'রে ঘুরে দাঁড়াই দিদি, পুরুষই তো……"

—যেন ক্লান্ত হয়েই ঝিমিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"কত বলবো আর কতোই বা শুনবে তুমি দিদি? একখানি মহাভারত…রুদরাস্তও ব'লে গেলে শেষ হবে না।…এই যে বেরিয়েছেন বাড়ি-ঘর চোরের জিম্মেয় রেখে দিয়ে—একটা মনিষ্যিকে আসতে ব'লে এই যে পাড়া টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন, এর হেতুটা যদি জানতে! তা আর কেউ না জানুক, হারাণের চোখে ধুলো দিবি এত-

বড় মন্দ-মেয়ে তো হোস্‌নি তুই এখনও। মিটিং দিদি—দল পাকানো। হ্যাঁ, এই তো আসছে এখুনি, সারারাত তো টহল দিয়ে চলবে না, ফিরতে তো হবেই ঘরে, ত্যাখন তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে বোলো—মিটিং ছেল কি অন্য কিছু। জিজ্ঞেস করবে—তুমি কি ক'রে জানলে। আমি জানলুম……"

আবার চুলটা খাম্‌চে খানিকটা চুপ ক'রে ব'সে রইল হেঁট হয়ে, —মাথাটা একটু একটু ঢুলচে…

"তাহ'লে য্যাখন্ ঘরের কেচ্ছা রইলোই না চাপা, ত্যাখন্ সবটাই শোনো। আর তুমি শুনবে—সেটাকে তো ঘরের বাইরে বেরুনোও বলবো না। বিনোদ সা' বিনোদ সা'—যার মুখেই শোন, বিনোদ সা' ভেন্ন যেন তার কথা নেই, তাই একদিন মনে করলুম—দেখতে হচ্ছে তো, কে এই বিনোদ সা', হাতি, না ঘোড়া। তাই একদিন কি খেয়াল হ'তে গিয়ে উপস্থিত হলুম দিদি, আর অন্য কিছু মতলব নয়, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, ব'সে আছি দোকানে—আমরা এদিকে পাঁচজন—আমি, কালু শেখ, বেচারাম, নটবর আর মথুরা, এমন সময় কোথাও কিছু নেই, গনগন ক'রে খামোকা এক পল্টন গিয়ে হাজির। পল্টন ভেন্ন আর কি বলি দিদি তাকে? একজন নয়, দু'জন নয়, গুণে গুণে—আটজন! তার মধ্যে নটবর, মথুরা আর কালু শেখের বৌকে চিনলুম—আর সবাই অচেনা। হ্যাঁ, আর একজনকে চিনলুম, অষ্টপহর চোখ ধাঁধিয়ে রয়েছেন, না চিনে তো উপায় নেই—চিনলুম পরমপূজনীয় সীল সীমতী কালিদাসীকে—অবিশ্যি চেনা শক্ত, গাছকোমর ক'রে আঁচলটা জড়ানো, চুড়িগুলো টেনে ওপর হাতে তোলা—চোখ দুটো ভাঁটার মতন জ্বলছে, দেখলেই বোঝা যায়—ইনিই হচ্ছেন কম্যাণ্ডার-ইঞ্চি!…এসেই দোকানের সামনে সার বেঁধে দাঁড়ালেন আটজনে, তারপর গলা ছেড়ে বিনোদ সা'র বাপন্ত-চোদ্দ-পুরুষান্ত!…'মদ গিলিয়ে গিলিয়ে গেরস্তর সব্বনাশ করছিস্, মনে করেছিস্ ট্যাকার কুমীর হয়ে বসেছি, আমার আর

কে কি করবে? ছাখ পোড়ারমুখো, কেউ কিছু করতে পারে কিনা—তোর দোকান সুদ্ধ্যু উপড়ে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেবো। চোদ্দ-পুরুষের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো তোর, তবে আমাদের শান্তি!'…সে কী ভাষা, কী ভঙ্গিমে, কী গমক, আটটা ফায়ার বিগেডে তোড়ে বেরুচ্ছে, দোকান যেন ইঞ্জিন-ঘর দিদি।…বিনোদ সা' তো উঠে এসে একবার আমাদের হাতে পায়ে ধরে দোকান ক্লিয়ার ক'রে দেওয়ার জন্যে—একবার ওদের সামনে গিয়ে হাত জোড় ক'রে ব্যাগ্যতা করে—তা বেরুবে যে লোকে, কোথায় বেরুবে? সে তো আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দেবারই সামিল দিদি—স্বইচ্ছেয় তো কেউ পারে না—দোমনা হয়ে কি করবো ভাবছি পাঁচজনে বলিদানের পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে, এমন সময় কালু শেখের বৌ খাদিরন বিবি হঠাৎ যেন চিলের মতন ছোঁ মেরে ঢুকে প'ড়ে কালুর হাতটা কড়কড়িয়ে চেপে ধরলে। বাস্। আর দেখতে নেই, সঙ্গে সঙ্গে বাকি সাতজন যেন তাড়কা রাক্কুসীর মতন……"

সদর দরজায় আওয়াজ হলো—"কৈ রে সত্য!"

হারাধন পা দুটোয় হাত দিয়েই ছিল, এবার একেবারে মাথাটা চেপে দিয়ে সুরা-দ্রব-স্বরে যতটা সম্ভব আকুতি ঢেলে ব'লে উঠল—"দোহাই দিদি, পরম গুরুজন জেনেই বললুম, কিন্তু এর একটি কথা বলবে না তোমার বোনকে, তাহ'লে আর……"

"বলতে হবে না, বোন্ নিজেই সব শুনেছে।…পা ছাড়ো দিদি এসেছে।"

—ওদিকে একটা সাড়া দিয়ে উঠে পড়লো কালিদাসী।

একটু যে ঠেলা লাগলো, তাতে বোধহয় উল্‌টে পড়েই যেতো হারাধন, কিন্তু নেশাটা হঠাৎ ছেড়ে যাওয়ায় সামলে নিলো; তারপর তাড়াতাড়ি চৌকির ওপর উঠে বসে মূল থেকে পরিণাম পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।

এল্ এল্ (L L)

ওদিকে কাজ থাকায় এখন আমি কিছুদিন থেকে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে রয়েছি।

বাসাটা মৌলালী থেকে খানিকটা আরও দক্ষিণে গিয়ে একটা ফিরিঙ্গি পাড়ায়। গোবরাকে লিখেছিলাম, কাছাকাছি থাকে, ওই ঠিক করে দিয়েছে। আমায় লিখল, আপনি সাহিত্যিক মানুষ। জায়গাটা নিরিবিলি হবে, তা ভিন্ন এরা আপনাকে সভাপতি হতে বলবে না, একটু স্থির হয়ে বসে সভাপতি হওয়ার মতো কাজ ক'রে-যেতে পারবেন।···সুবিধে পেলেই আমার জীবনের এ দিকটা নিয়ে খোঁচা না দিয়ে ছাড়ে না।

বাড়িটি ছোটখাট, কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন আর ছিমছাম। ওপরে-নীচে তিনখানি মাঝারি সাইজের ঘর। নীচে আর একখানি একটু বড়; হলঘরের কাজ করে। সামনে ছোট্ট টালি-পাতা উঠানটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা, রাস্তায় বেরুতে এক জোড়া গেট। এদের প্রায় সব বাড়ির মতোই কিছু কিছু ফুলের গাছ, লতা, ফার্ণ, অর্কিড এসবও রয়েছে। অপর দিকে, শ্লোগান, মিছিল, লাউড স্পীকার নেই। একলা মানুষ, একটু বেশি নিরিবিলি বোধ হয় এক এক সময়, তবু ভালোই আছি। সন্ধ্যার পর প্রায় নিয়মিতভাবেই গোবরা আসে। গল্পগুজব হয় খানিকটা। একলাই আসে, তবে দু' একজনকে সঙ্গেও আনে কখনও কখনও। কিন্তু যেন শর্ত ক'রে আনে সাহিত্য বা সংস্কৃতি নিয়ে কোন কথা হবে না, কিম্বা হয়তো এমন সঙ্গীই বাছে যাদের ও-সবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

একলাই এল সেদিন। আমি দোতলার সরু বারান্দাটিতে একটা আরাম-চেয়ারে বসেছিলাম, বেশ একটু অন্যমনস্ক থাকায় টের পাই নি কখন গোবরা উঠে এসেছে। সিঁড়ির মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল —"সন্ধান পেয়ে গেলো নাকি দাদা?"

একটু চকিত হয়ে উঠে বললাম,—"না, সে সব কিছু নয়।"

"তবে ? একটু যেন চিন্তিতই দেখছি যে ?"—বলে তখনই সামলে নিয়ে বলল—"থাক না হয় যদি তেমন কিছু হয়তো। আমি বলছিলুম—আমার এক্তিয়ারের মধ্যের যদি কিছু হোত। ...পাড়ার এদের কোন উপদ্রব নেই তো দাদা ?"

জানালাম,—না, সে সব কিছু নয়।

আবার সে একটু চুপচাপ যাচ্ছিল তার মাঝেই গোবরা উঠে পড়ল এক সময়। বললাম—"উঠলে কেন ? বোস।"

"বোধ হয় পাকড়াও করেছে দাদা, কথা সাজাচ্ছেন মনে মনে। ডিস্‌টার্ব করব না।"

বসিয়ে বললাম কথাটা।

আমার বাল্যবন্ধু রমেশের হঠাৎ চাকরিটি যাওয়ায় বড় বিপন্ন হয়ে পড়েছে। টেলিগ্রাম করে দিয়েছি আসতে, আসছে। কিন্তু রুজি গেলে বসে খাওয়ার মতো সঞ্চয় নেই তো, বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে মনে হোল।

গোবরা প্রশ্ন করল—"কি কাজ করেন দাদা ?"

বললাম—"মাস্টারি। বেহারের একটা প্রাইভেট স্কুলে।"

"গ্র্যাজুয়েট ?"

বললাম—"বি-এস-সি, বি-টি। বয়েস হয়েছে, আর বেশি দিন চাকরি করা দরকারও হবে না। দুটি ছেলে, দুটিই প্রায় তোয়ের হয়ে এল, তবে ওদের বের করে আনতে একলার উপার্জনে এমনই বেশ স্ট্রেন যাচ্ছিল, তার ওপর এই হঠাৎ চাকরি যাওয়া।"

"কেন গেল চাকরি দাদা ? যদি আপত্তি না থাকে তো..."

"একটু সিধে মানুষ। প্রাইভেট স্কুলের রাজনীতি—সবার মন জুগিয়ে চলতে না পারলে তো..."

গোবরা হেসে বলল—"দুই বন্ধুর একই রোগ দেখছি। হেঁটুর বয়সীও নয় আপনাদের কিন্তু দুনিয়াটাকে চিনতে কসুর করিনি দাদা।

এমন মন যোগাব সবার যে এ-ওর বাপান্ত না করে জল খাবে না। মাঝখান দিয়ে নিজের কাজ জলের মতন এগিয়ে যাবে।...তাঁরও লেখা রোগ...মানে তিনিও লেখেন-টেকেন নাকি ?"

আমি উত্তর দেওয়ার আগে নিজেই কথা উল্টে নিয়ে বলল—"থাক, আদার ব্যাপারী, আমার অত খোঁজে দরকার কি ? আসতে বলেছেন, আসুনইনা আগে। ভগবান সিধে মানুষ করে তোয়ের করেছেন বলে এতই কি মুখ ফিরিয়ে থাকবেন ? হবেই কোন উপায়।"

অন্য কথা পেড়ে এটা চাপা দিয়ে দিল।

একটানা পাঁচ দিন অনুপস্থিত থেকে আবার একদিন হঠাৎ ঐ সময় এসে পড়ল গোবর। প্রশ্ন করল—"আসেন নি উনি দাদা ?"

বললাম—"না, সমস্ত সংসারটা আবার ঠাঁই-নাড়া ক'রে গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে আসতে হবে তো। আর এখানে আসা সেতো কয়েক দিনের জন্যে মাত্র ; মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে, ছেলেবেলার বন্ধু, আমিই জোর করে আসতে লিখেছি।"

একটা চেয়ার বের করে নিয়ে এসে বসতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে একটু যেন নিরাশ হয়ে বলল—"তাহলে, আমি মিছিমিছি এত খেটে মরতে গেলুম কেন !"

বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম—"বুঝলাম না তো। খেটে মরা কি ?"

"তাও, আবার সাহিত্য রচনা দাদা, আমার চোদ্দ পুরুষে যা করেনি কখনও।...সে কথা থাক ; আসা মাত্র সদ্য সদ্য রুজি পেয়ে গেলেও থাকবেন না ?"

"কি রকম রুজি ?"

"বাংলা জানেন তো ? পড়াতে পারবেন ?"

"বেহারের প্রাইভেট স্কুলের বাঙালী মাস্টার, উঁচু ক্লাশগুলোতে ওকেই বাংলা সাহিত্য পড়াতে হোত।..."

"চুলোয় যাক সাহিত্য..."

—কথাটা বলে ফেলেই জিভ কামড়ে একটু লজ্জিত হয়ে গিয়ে বলল —"বলছিলুম মাথায় থাকুন সাহিত্য। অ-আ, ক-খ পড়াতে পারবেন ? আর সেলেটে দেগে দেবেন, ওরা বুলুবে। আপাতত এই ‥"

"কি বলছ তুমি ? খুবই বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম, —"রমেশ অ-আ পড়াবে !"

"ক্ষতি কি দাদা ? ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা করে আমার ফি, তুমি অ-আ পড়বে কি সাহিত্য পড়বে কি সায়েন্স পড়বে, সে তোমার অভিরুচি।"

"তা পড়াতে বাধা আছে এমন বলছি নে তো, কিন্তু…"

বসে পড়েছিল চেয়ারে, একটু যেন চাঙ্গা হয়ে উঠে পড়ল, বলল— "দাঁড়ান দাদা। এত অন্যমনস্ক থাকেন, গোবরা হতভাগা এল এত দিন পরে, একটু চা-টোস্টও…"

নেমে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসে বসতে বসতে বলল—"তাহলে হবেন তো রাজি ? বাঁচালেন। আমি মনে করলুম সব বুঝি পণ্ডশ্রম হলো। আচ্ছা দাদা, কে কি রকম উদ্দেশ্য নিয়ে লেখাপড়া শিখতে আসছে, সৎ কি অসৎ—তাও কি আমায়ই ভাবতে হবে ?"

বললাম—"জ্ঞান অর্জন—তা কি অসৎ হতে পারে গোবর ?"

"এই তো, আমারও কথা তাই দাদা। মাস্টার জানে ছাত্র এসেছে জ্ঞান অর্জন করতে ; টাকা পাচ্ছে, বেচারি সময় দিয়ে পড়াচ্ছে। এখন ছাত্রের পেটের মধ্যে কি আছে…"

"ছাত্রটি কে ?"—খানিকটা রহস্য রেখে কথা বলা অভ্যাসই গোবরের ; আমি পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য প্রশ্নটা করলাম।

"একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দাদা !"

"এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ! তার হঠাৎ বাংলা পড়ার ঝোঁক যে !"

মুহূর্ত খানেকের জন্য যেন আটকে গেল উত্তরটা গোবরার, তার পর বেশ সহজভাবেই বলল—"কি করে জানব দাদা ? আমায় শুধু বললে, মিস্টার গোবর, আমার বাংলা শেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে, একজন ভালো মাস্টার যদি যোগাড় করে দিতে পার। আপনার বন্ধুর

কথা জানাই ছিল, বলতে একেবারে হামড়ে পড়ল। বলে স্কুলে সাহিত্যের মাস্টার, তবে তো খুব অল্প সময়েই আমায় তোয়ের করে দিতে পারবেন। আজই নিয়ে চলো তাঁর কাছে।"

বললুম, "দাঁড়াও সায়েব, তিনি আসুন আগে।"

চা টোস্ট এসে পড়ল। আরও ছ'একটা একথা সেকথার পর উঠে পড়ল।

রমেশ সেইদিনই গোবর চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ল। সকালে তাকে ডাকিয়ে পাঠালাম। এসে সব ঠিকঠাক করে গেল এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পর নিয়ে এল রমেশের ছাত্র। নাম মিস্টার কে. টেলর।

প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়স, রোগা, একটু ঝুঁকেও পড়েছে, তবে বেশ ফিটফাট, যেমন ওরা এ বয়সেও সাধারণত থাকেই। মুখে একটা বর্মা চুরুট, হাতে একটা সিং দিয়ে বাঁধানো শৌখীন ছড়ি। ওদিকে গোবরের হাতে একটা শ্লেট আর একটা প্রথম ভাগ।

গোবর আগে বয়সের কোন আন্দাজই দেয় নি। ছাত্রই যখন, একটা আন্দাজ করে আমরাও জিগ্যেস করা দরকার মনে করিনি, একটু হকচকিয়ে গিয়েই সামলে নিলাম কোন রকমে। মিস্টার টেলর বেতের টেবিলে ছড়িটা রেখে আমাদের ছ'জনের সঙ্গে করমর্দন করে সামনের চেয়ারটায় বসলেন। গোবর আমাদের মানা করে দিয়েছিল পড়া নিয়ে কোন কথা তুলতে, আমরা আর কৌতূহল দেখালাম না। সাধারণভাবে একটু পরিচয় আর অন্য ছ'একটা কথা হোল। মিস্টার টেলর রেলওয়ে গার্ড ছিলেন, অবসর গ্রহণ করে বাড়িতেই আছেন, ঘোরার অভ্যাস, কখনও কখনও একটু বেরিয়েও পড়েন দিন কতকের জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক সময় বই আর স্লেট নিয়ে রমেশের সঙ্গে নীচে নেমে গেলেন। হলঘরে পড়ার জায়গা হয়েছে।

বেশ বিস্মিত হয়েই গোবরকে প্রশ্ন করলাম,—"কি হে, ব্যাপার কি বল দিকিন ?"

হাত একটু চিতিয়ে গোবর বলল—"কি জানি দাদা ? ভাঙে না তো কিছু। টাকা আছে, বোধ হয় খেয়াল একটা। উত্তর মেরু ছুটছে কেন, দক্ষিণ মেরু ছুটছে কেন, মঙ্গলগ্রহে রকেট পাঠাবার কি দরকার বলুন না ? সেই বিদ্‌কুটে জাতই তো ? না হয় একটু কি যে বলে…" ব'লে হাসল।

মিস্টার টেলরের শিক্ষকতা আরম্ভ হয়ে গেল। দু'ঘণ্টা করে পড়বে, দেবে একশত টাকা।

তিন দিন গোবর আর এল না। চতুর্থ দিনে সন্ধ্যার পর এসে বলল—"রমেশবাবুর যে ভয়ানক নাম বেরিয়ে গেছে দেখছি ফিরিঙ্গি পাড়ায়। এজ্‌রা লেন দিয়ে আসছি, ব্রাউন সায়েব বেরিয়ে এসে টেনে নিয়ে গেল।—মিস্টার গোবর, কে একজন মিস্টার মিত্রা এসেছেন আমাদের পাড়ায়, নাকি খুব ভালো কোচ্ (Coach) একজন, খুব তাড়াতাড়ি বাংলা শিখিয়ে দিচ্ছেন, আমায় যদি একটু ব্যবস্থা করে দাও, খুবই বাধিত হব।··বললুম বাধিত হওয়ার কি আছে সায়েব ? তুমি টাকা দেবে, তিনি মেহনত করে পড়াবেন। তবে তাঁর সময় হবে কিনা খোঁজ নিতে হবে।

তা দাদা, ওঁর অভাব তো সময়ের নয় এখন, খাড়া মানুষ, তাই সে দিক দিয়ে যথেষ্টই দিয়েছেন ভগবান ; রাজি হবেন ?"

রমেশ নীচে পড়াচ্ছিল, বললাম—"ডাকিয়ে এনে জিগ্যেস করি ওকে ?"

জিভ বের করে হাত নেড়ে উঠল গোবর, বলল—"আরে রাম ! অমন ভুল করে ! প্রথমভাগ, তাও এখন অ-আ চলছে, চৌষট্টি বছরের বুড়ো, ক'দিন চলবে কিছুই বলা যায় না। মাস্টারের মেহনতের মধ্যে শুধু বসে থাকা। ঐতেই তো যশ, উঠে আসতে আছে কখনও ? হবেনই রাজি। ওটা ব্রাউনকে একটা ভাঁওতা দিলুম মাত্র। এর সময়,

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে সাতটায় আসবে, ঘড়ি ধরে ঠিক নটায় ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাবে।"

প্রশ্ন করলাম—"এ বুঝি ছেলেমানুষই তা হলে? বয়স কত হবে?"

"টেলরের চেয়ে দু'চার বছর বেশি হবে মনে হয়। তবে দেখায় যেন ঐ বয়েসেরই, এর মতন খেঁকুরে নয় তো, শরীরটা একটু হাড়ে-মাসে।'

তার পরদিন যথাসময়ে ব্রাউন সায়েব গোবরের সঙ্গে এসে উপস্থিত হোল, গোবরের হাতে একটা নূতন স্লেট আর একটা নূতন প্রথমভাগ।

এর পর দিন চারেক যেতে না যেতে গোবর আরও দু'জনকে টেনে তুলল, রবার্টসন আর মার্টিমার। একজন ইঞ্জিন ড্রাইভার, একজন একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের ফোরম্যান। দুজনেই চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বসে আছে। সময় ঠিক হোল একটা থেকে তিনটে, আর চারটা থেকে ছটা।

প্রশ্ন করলাম—কিন্তু একি ব্যাপার গোবর?—সব এই বয়েস, আর রিটায়ার্ড হ্যাণ্ড। এদের হঠাৎ এরকম বাংলা পড়বার ঝোঁক হোল কেন বুঝছি না যে!"

গোবর হেসে বলল—"এই দেখুন, আপনি সোজা কথাটা বুঝছেন না দাদা! আমাদের হ'লে বলত—তিনকাল গিয়ে চারকালে ঠেকল, এইবার হরিনামের মালা নিয়ে বসা যাক আর কি! ওদের তো তা নয়। আর একটা লক্ষ্য করবেন দাদা, সবাই হাতুড়ি পিটে কিম্বা গাড়ি চালিয়ে জীবনটা নষ্ট করেছে। এখন বোধ হয় ঐ আপনি যা বললেন জ্ঞানার্জন—তাই একটু করে নিতে চায়।···আরও আসতে চায় দাদা। কিন্তু থাক, বেশি লোভে কাজ নেই, কি বলেন?"···

বললাম—"সময়ও তো নেই আর, এক যদি এক সঙ্গে পড়তে রাজী হয়।"

গোবরা প্রায় শিউরে উঠল—"না দাদা, অমন কাজ করবেন না,

একেবারেই রাজী হবে না তাতে···ওদের দেখেছেন তো, সব ছাড়া-ছাড়া, ছিম-ছাম। একগাদা বিয়ে করে গাদা-খানেক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যেমন ঘর করতেও চায় না; আর বিয়েও যদি করলে একটা তো স্ত্রী বাঙ্গালোরে, নিজে বালিগঞ্জে।—না, ওতে কোন মতেই রাজী হবে না।"

খুব বেশি রকমই যেন জোর দিল কথাটায় গোবর।

নীচের ঘরটা যেন একটা পাঠশালা হয়ে পড়ল। "স্বোড়ে-অ", "স্বোড়ে-আ"···দিন কতক পরে "অজ-আম, অচল-অটল" তারপর "জোলপোড়ে, পাটা নোড়ে"···একজন যায় তো একজন এসে যেন ধুয়ো ধরে। রমেশ বলে—"ওহে, কী ব্যাপার ভাই? অবিশ্যি টাকা পাচ্ছি—ওদেশে যেমন বলে 'ছাপ্পর ফোড়কে' দেন ভগবান, এও তাই। কিছুই করতে হচ্ছে না. কিন্তু এই না করাটাই যে অসহ্য হয়ে উঠেছে···"

তিনটে মাস কেটে গেল।

কঠিন পরিশ্রম করছে। আরও আধ ঘণ্টা করে বাড়িয়ে নিয়েছে, টেলার পুরোপুরি এক ঘণ্টা। দ্বিতীয় ভাগে এসে পড়েছে সবাই; ওপর থেকে শুনি—"র্ক, দুর্গম, দীর্ঘ, মহার্ঘ···চিক্কণ, ঢিক্কার"··· কিম্বা—"এ সকোল গুণ ঠাকিলে কি হয়, মাঢবের একটি মহট ডোষ ছিল··"

—যে যতটা এগুতে পেরেছে। উৎসাহ বজায় রাখবার জন্য চারজনেই একটু করে সুরা পান করে আসে। একজনেরই পাঠশালা, কিন্তু গলা ছেড়ে দেয়, ভারী, মোটা সায়েবী গলা, ছোট্ট বাড়িটা যেন গমগম করতে থাকে।

রমেশ বলে—"ও শৈলেন আর তো পারি না ভাই।···আর কিছু বুঝেও তো উঠতে পারছি না, এক একবার মনে হয় কেটে পড়ি। বেশ কিছুই তো এলো হাতে। বাড়ি গিয়ে ভালো ক'রে চেষ্টা করি দিন কতক"

তারপর হঠাৎ একদিন দুর্ভোগটা কাটল। দরখাস্ত ছাড়ছিল

চারিদিকে, পাটনার একটা স্কুল থেকে জবাব এল। ভালো পোস্টই, টেলিগ্রামে ডেকে পাঠিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল রমেশ। বলল—"গোবরকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোল ভাই। ওদের বলে যেতে হলে চারজনে এসে টানাটানি শুরু করবে, সে এক হাঙ্গামা। একশ-দেড়শ টাকায় দ্বিতীয় ভাগ পড়াবার লোক পেতেও দেরি হবে না কলকাতা শহরে। গোবর দেবে যোগাড় করে।"

বিকালের টুইশনের পরই টেলিগ্রামটা এসেছিল, গোছগাছের হাঙ্গামা নেই; ঘণ্টা-খানেকের ভেতরই বেরিয়ে পড়ল। ও যাওয়ার পরই কয়েক মিনিটের মধ্যে গোবর এসে পড়ল, আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সব কথা বললাম।

এতটুকু নিরাশ হওয়া, কি বিরক্ত হওয়া, কি বিস্মিত হওয়া, কিছু নয় একেবারে। আগাম মাইনের যে কটা টাকা ফেরত দিয়ে গেছে রমেশ, হাতে নিয়ে শুধু বলল—"স্কুল-এ কটা দিন অপেক্ষা করতে পারত না?"

বললাম—"সময়ের কথা বলছ?—ওদের ক্ষতি হবে? তা একজন লোক ঠিক করে দেওয়া—সে আর এমন কি?"

গোবর মাথাটা নেড়ে জিভ কামড়ে বলল—"আরে ছিঃ! আবার! এবার বাড়াতে গেলে যে অধর্ম দাদা। এ, নেহাত একটু দরকার পড়ে গিয়েছিল তাই···"

"কী ব্যাপার বলতো গোবর। একটা যেন রহস্য রয়েছেই, কাটতে চাইছে না; হঠাৎ একদল বুড়ো···"

"বলতেই হবে যে দাদা, না-না করেও তো খানিকটা পাপ স্পর্শ হোলই—আমার কথা বলছি—আপনারা তো আগুনের মতন নিষ্পাপ, কিছুই জানেন না। না বললে তো শুদ্ধ হ'তে পাচ্ছি না।"

টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁক কাটতে কাটতে মাথা হেঁট করে বলছিল, হঠাৎ মাথাটা তুলে বেশ একটু ঘৃণা আর বিরক্তির সঙ্গে বলে

উঠল—"কিন্তু কী বজ্জাত দেখুন আবাগের বেটারা, ওদের এতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে মনে করেন ?—বেটারা কি না···"

"ব্যাপারটা কি ? একটু খুলে না বললে..."

গোবর লজ্জিতভাবে হেসে আবার চুপ করে মাথা নীচু করল। তাগাদা দিতে আরও সঙ্কুচিত হয়ে বলল—"আপনার সামনে কী করেই যে মুখ দিয়ে বের করি ? বজ্জাতগুলো আমার আর লজ্জা সরম বলে কিছু থাকতে দিলে না ইয়ে—মানে, সবটুকুর গোড়ায় L. L (এল্-এল্) দাদা।"

আরও সঙ্কুচিতভাবে মাথা নীচু করল। আমি প্রশ্ন করলাম—"L. L 'টা বুঝলাম না তো ?"

আপনার কাছে সেদিন রমেশবাবুর কথা শুনে যাচ্ছি, মনটা খুবই খারাপ দাদা, আপনার বন্ধু, অথচ গোবরা হতভাগা কিছুই করতে পারবে না ? যাচ্ছি ভাবতে ভাবতে এমন সময়···তাকে দৈব না বলে কি বলি দাদা ?"

"জিনিসটা কি ?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"গলির মাঝখানে একটা গোলাপী খাম ; প্রায় মাড়িয়েই ফেলেছিলুম, নিজের খেয়ালেই যাচ্ছিলাম তো, তুলে দেখি ঠিকানা লেখা—মিস্টার কে. টেলার, অমুক গলি, এত নম্বর বাড়ি। কোনও উজবুকের পকেট থেকে পড়ে গেছে বোধহয় কিছু বের করতে গিয়ে—রাত্তিরে ওরা আবার একটু বেহেড্ থাকে তো : বোধ হয় ক্লাব থেকেই টেনে-টুনে ফিরছিল।···ভুরভুর করছে এসেন্সের গন্ধ, আর খামের বাঁ কোণে একটা উড়ন্ত ঘুঘু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের যেখানটায় থাকে প্রজাপতি। একটা যে লভ্ লেট্—(love let···)

গোবর হঠাৎ থেমে গিয়ে জিভ কামড়াল। সামলে নিয়ে বলল—"নির্ঘাৎ একটা যে ইয়ে চিঠি তাতে কোনই সন্দেহ নেই। ভাবলাম—মরুকগে, L. L-ই হোক বা যাই হোক আমার তাতে কি ?···হাতে হাতে দেওয়া চিঠি। ঠিক করলাম কাল একখানা টিকিট মেরে পোস্ট

করে দেওয়া যাবে। পকেটস্থ করে বাড়ি চলে এলাম। এসে দেখি যা ভেবেছিলাম তাই দাদা।”

প্রশ্ন করলাম—“পড়লে তুমি?”

গোবর একটু ঝুঁকে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল—“পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি দাদা, আপনি গুরুজন—কোন রকম পাপ মনে নিয়ে পড়া নয়। ভাবলাম যদি খাঁটি না হয় তাহলে মাঝখান থেকে আমি গরীব মানুষ ডাকটিকেট দু’ আনা পয়সা খরচ করে মরি কেন নাহক!…তা যেটা ভয় করা সেটাই কি ফলতে হয়? স্ত্রী কোথায়? কে একজন ফ্লোরা…”

আমি বললাম—“স্ত্রী নয় কি করে জানলে? পদবী টেলর সেটা দেয়নি। বড় একটা দেয় নাও তো, ক্রিশ্চান নামটাই দেয় চিঠিতে।”

“চিঠির একটা ঢংও তো আছে দাদা।…থাক্, একটু সংক্ষেপই করে দি, গুরুজনের সামনে কী লজ্জাতেই যে ফেললে আবাগের বেটা!… স্ত্রীর যে নয়—বেটার বুড়োবয়সে রোগে ধরেছে, সেটা পরেও প্রমাণ হয়ে গেল কি না।”

“কি রকম?”—আমি প্রশ্ন করলাম।

“সমস্ত রাত ঘুম নেই, একে রমেশ দাদার ভাবনা, তার ওপর এই নতুন উপদ্রব। শেষে মাথা খেলিয়ে খেলিয়ে একটা ঠিক করে ফেলে সত্ত সত্ত কাজে নেমে পড়া গেল; লাগে তো তুক্, না লাগে, তাক্। মানে, ফিরিঙ্গীর জায়গায় বাঙালী এনে ফেলা আর কি। রোগটা তো রয়েছেই। দু’টো দিন বাদ দিলাম, তারপর একটু রাত হ’লে কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়ে টেলরের গলিটা বের করে নম্বরের ওপর চোখ রেখে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। নির্জন গলি, আলোর ব্যবস্থাও ভালো নয়, কাছাকাছি এসে নম্বরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যেন নিজের কাজেই এগিয়ে যাচ্ছি, এদিকে বুকটা ধড়ফড় করছে, ওর বাড়িটা থেকে দু পা এগুতে না এগুতে গেটের কাছ থেকে ডাক পড়ল—‘হাল্লো! আপনি কি বাঙালী?’…ঘুরে দেখে বললাম—‘আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো?’

গোবর থেমে গিয়ে একটু লজ্জিতভাবে হাসল, বলল—"এত শাগ্‌গির যেকাজ হাসিল হবে ভাবতে পারিনি দাদা, তাঁর দয়া। ওপরে নিয়ে গিয়ে আদর করে বসিয়ে চা-টোস্ট-কেক্। তারপর একটা গোলাপী খামের ভেতর থেকে একখানি চিঠি। ...'মিস্টার গোবর, এখানি তোমায় একটু পড়ে বুঝিয়ে দিতে হবে আমায়।' ভেরি সরি (very sorry), বাংলা আমি জানি না।

আজ্ঞে হ্যাঁ দাদা, এটা বাংলায়। আর ঐ L. L. খামের ওপর আর ভেতরে চিঠির কোণে প্রজাপতি। ...সে আকুলি বিকুলি, সব তো আপনাকে বলা যায় না, দাদা, তবে আসল কথা, যাতে আমার কাজ—শেষের দিকে ঐ আব্দার—লিখছে আমি বাঙালীর মেয়ে, ইংরেজী জানি না—কলকাতার অনেক সায়েব বাংলা জানে, সেই ভরসাতেই চিঠি দিচ্ছি, যদি না জান তো শিখে তাইতেই উত্তর দিতে হবে, আমি দু' মাস, চার মাস, এক বছর, দু' বছর অপেক্ষা করব।... এসব চিঠিতে যেমন থাকে।

পড়া বোঝানো শেষ হলে হাতে একখানি দশ টাকার নোট, আমার মেহনতের দাম, আর একটা ভালো বাংলা টিউটার যোগাড় করে দিতে হবে, যা লাগে।

সংক্ষেপেই বলি দাদা, আর কত লজ্জার মাথা খাব? টেলর থেকে ব্রাউন, ব্রাউন থেকে রবার্টসন, রবার্টসন থেকে মার্টিনার। সব বেটার টাকা আছে, রিটায়ার্ড, আর স্ত্রী নেই। প্রথমে যুবোদের কথা ভেবেছিলাম, তারপর টেলরকে দেখেই বুদ্ধি খুলে গেল আমার। ভেবে দেখলাম—এরা অত খতিয়ে দেখবে না, তাড়াহুড়োও আছে, কবরে ঢুকতে যাচ্ছে তো? সব চিঠিতেই ঐ এক কথা দাদা, ঐ আব্দার, বাংলা শিখে বাংলায় উত্তর দিতে হবে। দু'বছর, চার বছর, যতদিন..."

"কিন্তু গোবর,—এরকম একটা নোংরা ব্যাপারে আমাদের টানতে..."

গোবর একেবারে দুটো হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল। সেই

রকম লজ্জিত হাসি টেনে বলল—"নোংরা—সে যদি সত্যি কোন মেয়েছেলের লেখা হোত, কিন্তু দাদা, যদি কোন ব্যাটাছেলে রাত জেগে মাথা ঘামিয়ে······"

চোখ বড় বড় ক'রে ওর দিকে চেয়ে রইলাম, দুষ্টুমির চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মুখে হাসিও ফুটে উঠে থাকবে। গোবর এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল, ওর মুখটাও উজ্জ্বল হয়ে এসেছে, বলল—"সাত পুরুষে কেউ কখনও সাহিত্য-চর্চা করেনি··· মানে, ভাগ্যে ঘটেনি দাদা, কিন্তু চালিয়ে তো নিলাম আপনার আশীর্বাদে এক রকম করে।"

তিন কেষ্ট

রতন সাহার কেষ্ট স্বপ্নাদেশ দিয়ে আসবার ঠিক দিন পনরো পরে খেতন লাহারও স্বপ্নাদেশ হোল। খেতন লাহা পারিষদের সামনে তার যে বর্ণনাটা দিলেন সেটা এইরকম, "কোথায় যেন গেছি—ভালো একটা তীর্থস্থানই ব'লে মনে হচ্ছে, হঠাৎ একটি ছেলে যেন মাঠের দিক থেকে এসে সামনে দাঁড়াল। গায়ের রংটা কালো, পরনে একটা হল্দে কাপড়, মাথায় পালক গোঁজা; এদিকে রোগা ডিগডিগে, গায় খড়ি উঠছে। ভাবলাম, কোন সাঁওতাল ছেলে বুঝি। পরিচয়টা নিতে যাব, ওই জিগ্যেস করলে—'আমায় চিনতে পারছ না?'

বললাম—"কৈ না তো বাপু। কোথায় থাক তুমি? কর কি?"

'এই ভ্যাখো কাণ্ড! আমি হচ্ছি কেষ্টঠাকুর। তোমাদের পাড়াতেই তো রয়েছি আজকাল।'

"তা কেষ্টঠাকুর তো এমন দশা কেন? ঠাকুর এলে জায়গাটা কোথায় আলোয় আলোয় ঝলমল ক'রে উঠবে, এ যেন আরও অন্ধকার হয়ে গেল। আর কেষ্টঠাকুর—ঢলঢল চেহারা হবে, এ দেখছি যেন কতদিনের উপোসী, কতদিন তেল-জলের সঙ্গে দেখা নেই..."

বললেন—'সেই জন্যেই তো তোর কাছে আসা। আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যা। সুদখোর মানুষ, সে সুদের হিসেব রাখবে, না, আমার হিসেব রাখবে? খেতে পাচ্ছি কিনা, সেবা-যত্ন হচ্ছে কিনা। বাইরে বাইরে একটা ভড়ং বজায় রেখে চলেছে, কী না আমি একজন মস্ত বড় ভক্ত। আমি বলি—আরে এসব দিয়ে আমায় ভোলাবে? আমি হলুম শঠের চূড়ামণি যশোদানন্দন কেষ্ট, তুমি তো সামান্য রহিমগঞ্জের...'

"এই সময় কাক ডাকার শব্দ কানে যেতে ছ্যাঁৎ ক'রে ঘুমটা ভেঙে গেল। নামটা আর শোনা হোল না।"

গড়গড়ার নলটা ঠোঁটে দিয়ে দু'টান ধোঁয়া গিলে মুখে একটু হাসি

টেনে খেতন লাহা পারিষদের দিকে একটু চাইলেন। প্রশ্ন করলেন—"কিছু বুঝলে ?"

পারিষদরা যা বুঝল জানাল। রহিমগঞ্জে তো ব'সেই আছে সবাই। দিল্লীও নয়, লাহোর নয় যে বুঝতে কষ্ট হবে। আর নাম—সে যখন বোঝাই যাচ্ছে তখন স্পষ্ট ক'রে না-ই বলে দিলেন ঠাকুর। তবে এর মধ্যে আসল কথা হচ্ছে—ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হওয়ার নয়। নেহাত দায়ে পড়ে ভক্ত জেনে ঠাকুর যখন এসে দাঁড়িয়েছেন তখন একটা ব্যবস্থা করতেই হয় তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনবার। সুদের হিসেবের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছেন, এখন একটু রাজবাড়ির আদর যত্ন পেতে চান আর কি !"

খেতন লাহা বললেন—"তাহলে করো তোমরা যোগাড়-যন্ত্র ! আমি কে ?—নিমিত্তমাত্র বৈ ত নয়।"

মফঃস্বলের বড় শহর। পাড়াটার নাম রহিমগঞ্জ। মাঝখান দিয়ে যে বড় সরকারী রাস্তাটা গেছে তার দু'দিকে সাহা আর লাহাদের বাড়ি। একেবারে সামনাসামনি নয়, এ-বাড়ি ছেড়ে মিনিট তিন চার হাঁটলে ও-বাড়ি পৌঁছানো যায়। লাহারা জমিদার, সাবেককালের তিনমহলা বাড়ি। সে-সব দিনের জলুস আর নেই অবশ্য, তবে একেবারে নিভে যায়নি। খেতন লাহা বিচক্ষণ মানুষ, ভালোভাবেই ঠাট বজায় রেখে যাচ্ছেন।

সাহারাও নূতন নয়, তবে নিতান্তই এক গৃহস্থ পরিবার হিসাবে এতদিন টিমটিম করছিল, তারপর বছর কয়েকের মধ্যে যেন হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। টিনের চালার মধ্যে ছটাকখানেকের একটা মুদির দোকান, তাই থেকে একেবারে আমেরিকান হালফ্যাশানের বাড়ি, বাগান, হালফ্যাশানের আসবাবপত্র—লোকেরা আন্দাজ করে উঠতেই পারছিল না, এই সময় আবার বাড়ির লাগোয়া জমি কিনে এই মন্দির, ঘটা করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ; বোলবোলাওয়ের আর কোন দিকটা যেন বাকি রইল না।

অনেকেরই ভালো লাগে না এসব, লাহাদের আরও ভালো লাগবার কথা নয়। তাই থেকেই এই স্বপ্নাদেশ। মন্দিরের তোড়জোড়ও আরম্ভ হয়ে গেল।

কথাটা রতন সাহার কানে উঠতে দেরি হোল না। পারিষদদের কিছু যেমন থাকে খাস তেমনি কিছু থাকে উভচর অর্থাৎ যারা দু' জায়গাই ধ'রে থাকে। কর্তাদের নিতান্ত অজানাও নয়, সবাই একনিষ্ঠ হ'লে ওদিককার খবর এদিকে হুবহু পৌঁছাবে কি ক'রে ?

রতন সাহার আলবোলা নয়, নস্য, সেই টিনের চালার আমলে যা ছিল। নাকের দু'দিকে দু' টিপ ঠুসে দিয়ে সশব্দে হাত দুটো ঝেড়ে বললেন—"বটে!"

তারপর একদিন স্বপ্নও দেখলেন। সদ্য সদ্য নয়, বেশ সময় বুঝে। তবে সে যা স্বপ্ন, একেবারে মোক্ষম। যে টিনের চালের ভেতর থেকে আমেরিকান সৌধে উঠে আসতে পারে তার স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতাটাকেও তো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না।

রতন সাহার কেষ্ট রোগা ডিগডিগে এই অর্থে যে মূর্তিটি বাঙালী ভাস্করের তৈয়ারী বাঙালী কেষ্টর মূর্তি; ছিপছিপে গড়ন, নরম দুলালি-দুলালি ভাব। সাজগোজেও বাহুল্য নেই; রাখাল বালক তার আবার সাজগোজ! ভক্তমহলে বেশ সমাদরও হয়েছে মূর্তির। খেতন লাহ'র স্বপ্নে কিন্তু গুণগুলাই উল্টে দোষে গিয়ে দাঁড়াল। দেবতাদের লীলা-খেলা, কোন্‌টে তাদের পছন্দ কোন্‌টে অপছন্দ বলাতো যায় না। আর এটা তো স্বীকার করতেই হয় যে, কেষ্টঠাকুর হুগলী-চব্বিশ পরগনার অমুক গ্রামের অমুক পাড়ার অমুক গয়লার বাড়ির ছেলে নয়। দ্বারকার রাজপুত্র, মথুরার রাজার ভাগ্‌নে, দ্বারকা থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত তাঁর লীলাভূমি, তাঁকে অমন ছিমছাম শৌখান চেহারায় দাঁড় করালে তিনি যদি ভক্তের কাছে এসে বিচার চান, গায়ের জ্বালায় সুদখোর কেপ্পন বলে অনুযোগ করেন তো দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে?

খেতন লাহা খাস জয়পুরে অর্ডার দিলেন। যেখানকার কেষ্ট

একেবারে সেইখান থেকেই আসবেন। সেখানকার ডাল-রুটি, খাঁটি ঘি-দুধ-মাখন খাওয়া কেষ্ট। রাজবাড়ির রাজভোগ খাওয়ার যোগ্য হওয়াও চাই তো।

মন্দির যখন আধাআধি উঠেছে আবার একদিন স্বপ্ন দেখলেন খেতন লাহা। ঠাকুর যেন এসে তিনি কতটা উঁচু হতে চান, কতখানি আড়ে কি ওজন কিরকম সাজগোজ প্রভৃতি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বলে দিচ্ছেন। পারিষদরা বলল—সোজা হিসাবেই তো বোঝা যাচ্ছে, স্বপ্ন কতটা খাঁটি। বাঁশি বাজাতেন সমস্ত গোকুলটা গমগম করে উঠত, কোথায় কোন্ প্রান্তে কে রুটি সেঁকছে কি কুটনো কুটছে কি বাটনা বাটছে—কানে গিয়ে পৌঁছাতো, ছেড়েছুড়ে ছুটে আসত। ঐ রকম পিলে রুগী কেষ্টর তো কাজ নয়।

ফরমাশের খুঁটিনাটি নিয়ে লোক ছুটল জয়পুর। স্বপ্নকাহিনীটা রতন সাহার কানে উঠল। নাকে নস্য টিপে হাত ঝেড়ে বললেন—“বটে, স্বপ্ন যে দেখছি বড়কর্তার একচেটে হয়ে উঠল !”

তারপর ওঁরও স্বপ্নাদেশ হোল। যেদিন মূর্তি এসে পৌঁছবার কথা ঠিক তার আগের দিন।

ঠাকুর যেন কাতর হয়ে বলছেন—“হ্যাঁরে, পুতনাকে চুষে খেয়েছি, কালিয় দমন করেছি, কংস বধ করেছি, গোবর্ধন ধারণ করেছি—কী না করেছি ? কিন্তু তার পুরস্কার কি এই ?—আমায় একেবারে মথুরার চৌবে পালোয়ান করে তুলবে ? নিজের দেহের বোঝা বইতেই যদি হিমসিম খেয়ে যাই তো এতবড় জগৎ-সংসারটার বোঝা বইব কি করে ?”

আরও ইনিয়ে বিনিয়ে যা বলবার তা তো বললেনই। তারপর বেশ একটু যেন খাপ্পা হয়ে উঠেই আদেশ করলেন—“না, কথাটা জানিয়ে দে চারিদিকে ভালো ক’রে, নয়তো শেষকালে দেখছি এইরকম পালোয়ান পুজো একটা রোগে দাঁড়িয়ে যাবে। দেশছাড়া করে দেবে আমায়।”

সকাল থেকেই স্বপ্নাদেশ পালনের জন্যে তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল।

আশ্চর্যের বিষয়, আরও সবাই নাকি স্বপ্ন পেয়ে প্রস্তুতই ছিল। বেলা আটটা পর্যন্ত বেশ একটি মাঝারি গোছের মিছিল রতন সাহার স্বপ্নাদেশটি শহরে চাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তৈয়ার হয়ে গেল। গান-ছড়া সমেত। কামারপাড়ার বটকেষ্ট সাজল কেষ্ট। ইয়া গালপাট্টা, ইয়া চুলে ভরা বুকের ছাতি পায়ের গোছটাই দু হাতের মধ্যে আসে না। বটকেষ্ট একটা বাঁশের ফ্রেমে কাগজ সাঁটা চাকা-ওলা নৌকোর মাঝখানে বসে একটা সিঙে নিয়ে প্রাণপণে ফুঁ দিতে লাগল—বাঁশির আওয়াজ সারা গোকুলের ঘরে ঘরে পৌঁছান চাই তো।

মিছিলটা সমস্ত শহর ঘুরে, যা বেরিয়েছিল ফুলে ফেঁপে তার চার গুণ হয়ে যখন জমিদার লাহাদের বাড়ির কাছাকাছি এসেছে, আর খানিকটা এগুলেই সামনাসামনি হয়, এই সময় আচমকা বাঁশিটা গেল থেমে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তুমুল সোরগোল উঠল—"কেষ্ট ডুবেছে! কেষ্ট ডুবেছে! কেষ্ট তলিয়ে গেছে!..."

তাই হয়েছে। একে ঐ লাশ, তার ওপর মোহন-বংশীর ধকল—বটকেষ্ট নৌকার তলা ফেঁসে একেবারে মাঝ রাস্তায়।

যেমন যেমন স্বপ্ন রতন সাহার, সেইরকম ক'রে সাজানো ব্যাপারটা, সবাই কেষ্ট বটকেষ্টকে মাঝখানে ক'রে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে লাহাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে সাহাদের বাড়ি গিয়ে উঠল।

আর, আশ্চর্য স্বপ্ন! যেমন-যেমনটি দেখানো হোল ঠিক সেইরকম ক'রেই কি ফলতে হয়! গাড়ি থেকে নেমে জয়পুরী কেষ্ট গঙ্গা পেরিয়ে আসছিলেন, মাঝ দরিয়ায় হঠাৎ নৌকার তলা ফেঁসে গিয়ে একেবারে অগাধ জলে। গুরুবল, কাছেই একটা অন্য নৌকা হাল টেনে আসছিল; কিন্তু গুরুবল সে শুধু মানুষ ক'টার জন্যেই; বর্ষার ভরা গাঙ, ঠাকুরকে আর বাঁচান গেল না।

ক'দিন চুপচাপ গেল, তারপর রতন সাহা নাকে লম্বা টানে নস্য গুঁজে হাত ঝেড়ে পারিষদদের প্রশ্ন করলেন—"কি হে, বড়কর্তা আর স্বপ্ন-টপ্ন দেখলেন এদিকে? তাহলে যেন টের পাই। আমার ঠাকুর স্বপ্ন দিয়ে জিগ্যেস করছিলেন।"

পারিষদরা মুচ্‌কি হেসে বলল—"তাঁকে জানিয়ে দেবেন, বড়কর্তার চোখে ঘুমই নেই আর তো স্বপ্ন দেখবেন কোত্থেকে?"

যথাসময়ে হোল স্বপ্নাদেশ খেতন লাহারও। জলমগ্ন হওয়ার ঠিক পনর দিন পরে!···জয়পুরে গিয়ে ফিরে আসতে একটা লোকের যে ক'টা দিন লাগে।

ঠাকুর যেন দিব্যি নেয়ে-ধুয়ে সাজগোজ করে এসে ঠোঁটে মুচকি হাসি নিয়ে বললেন—"অত মুষড়ে গেছিস কেন? হাড়-কেপ্পনের কেষ্ট, ফুঁ দিলে উড়ে যায়, ও আমায় নৌকোডুবি করে মারবে? মরুভূমির দেশ থেকে আসতে আসতে গঙ্গা দেখে একটু লোভে পড়ে গিয়েছিলাম। যা, গিয়ে নিয়ে আয় আমায়। আর কি রূপে আসছি সেটাও ভালো করে জানিয়ে দে সারা শহরে।"

এমন মহিমা ঠাকুরের, সব যেন তৈয়েরই ছিল। স্বপ্ন দেখামাত্র রাতারাতি লোক ছুটল গঙ্গার তীরে। আশ্চর্য, যেমনটি স্বপ্ন দেখা ঠিক তেমনটি হয়ে ঠাকুর উঠে যুগলমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন একটা তাল গাছে ঠেস দিয়ে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিছিলটা বেরিয়ে প'ড়ে শহরের রাস্তায় এসে উঠল।

প্রথমেই আগাগোড়া ফুলপাতায় সাজানো মোটরে জয়পুরী কেষ্ট, জমকালো জমকালো পোশাকে আর গয়নাগাঁটিতে সমস্ত শরীরটি মোড়া, মাথায় তিন তিনটে চূড়ার ঝলমলে মুকুট। ঠিক ঐ অনুপাতে বাঁদিকে শ্রীরাধিকা।

তার পেছনেই ঠাকুরের যেমন আদেশ হয়েছে, স্বপ্নকাহিনীটা জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা—

সেই কামারপাড়ার বটকেষ্ট এবারেও কেষ্ট সেজেছে। তবে একা নয়। দুই কাঁকালে দুটি দুটি করে আরও চারটি লিক্‌লিকে কেষ্ট বটকেষ্টর চাপের চোটে 'গেলুম, মলুম' করে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

যাতে কারুর বুঝতে কষ্ট না হয় তার জন্য রীতিমতো ছড়া আর গানেরও ব্যবস্থা আছে।

শহর ঘুরে সাহাদের বাড়ির সামনে এসে মিছিলটা একটু দাঁড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট বটকেষ্ট কাঁকালের কেষ্টদের বের ক'রে গলা টিপে টিপে ট্রাক থেকে নামিয়ে একটা করে ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলল—"যা, যা তোরা সব, আর ফচ্‌কেমি করতে আসিস নি যেন।"

এরপর মিছিলটা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে লাহাদের প্রকাণ্ড গেটের মধ্যে প্রবেশ করল।

লাহা-সাহাদের দুই কেষ্ট স্বপ্ন দিয়ে দিয়ে আসর জাগিয়ে রাখলেন। শহর যত সরগরম হয় নিজেরা তত ওঠেন তেতে, নিজেরা যত তাতেন শহর তত সরগরম হয়ে ওঠে। ব্যাপার বেড়েই চলল। সাহাদের কেষ্ট হুমকি দেন লাহাদের কেষ্টকে দেখে নেবেন, এদিকে খেতন লাহা কুরুক্ষেত্রের ভাবায় স্বপ্ন পাচ্ছে—মরলে অনন্ত স্বর্গ, জিতলে সসাগরা বসুন্ধরা···

জন্মাষ্টমীর মিছিল আসছে। শোনা যাচ্ছে সেইদিনই দুই ঠাকুর মিছিল করে বেরিয়ে একটা ফয়সালা করবেন। কার মাথা ঠ্যাং যায় কিছুই বলা যায় না। তারপর আদালত খোলা আছে।

সমস্ত শহরটা আহার নিদ্রা ভুলে মেতে রইল তীব্র আশা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে। স্বপ্ন দিয়ে দিয়ে দুই ঠাকুরের আর ফুরসত নেই অন্য কথা ভাববার।

আর এক কেষ্ট আছেন এই শহরেই; তিনি স্বপ্ন দেন না, সোজাসুজি কথা কন। তবে একজন ছাড়া শহরে আর কেউ জানে না সে কথা।

একটা গরীব বস্তির নোংরা গলির মধ্যে দুখানি চালাঘর নিয়ে কাঙালীচরণের বাড়ি। একখানির একপাশে কাঙালী আর তার পরিবারের মাদুরের ওপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানা গোটানো থাকে। একপাশে এটা ওটা দিয়ে সাজানো একটি জলচৌকির ওপর বিস্কুটের টিনের খোপের মধ্যে কাঙালীর কেষ্ট। টিনটা রাংতা দিয়ে মোড়া ; ঠাকুরের মন্দির।

ঠাকুরকে কাঙালী ছাড়া কেউ চিনতেও পারে না। কবে কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, বিঘৎখানেকের ঠাকুর। একটা পায়ের পাতা নেই, একটা হাতের পুরো আধখানাই লোপাট, মুখ-চোখ-নাকের প্রায় সবকিছু লেপা-পোঁছা।

গঙ্গাজলে নাইয়ে একটা পাটকরা ন্যাকড়া দিয়ে মোছাতে মোছাতে, চন্দন পরাতে পরাতে কথা কয় ঠাকুরের সঙ্গে—নানা কথা, তবে সেবা পূজার দৈন্য নিয়েই বেশি—

"আজ ফুল পেলুম না তেমন, এইতেই খুশী থাকতে হবে, কি করব একা মানুষ ?"

খুশীই হন ঠাকুর। প্রায় নেই-ঠোঁটে কোথায় যেন হাসি ফুটে ওঠে, যেন নড়েও ওঠে ঠোঁট—কাঙালী শোনে—"এইতেই বেশ হবে আমার, তুই বড় খুঁতখুঁতে।"

এক একদিন ঠোঁট দুটি যেন অভিমানে গুটিয়েও যায়। "এত কম ফুল ? নিজের ভাবনা নিয়েই থাকবি তো আর আমার কথা ভাববি কোথা থেকে ?"

"তা করবো কি বলো ?" নিজেও মুখ ভার করতে জানে কাঙালী—"তিনটে পেট দিয়ে বসে আছ, তিনটে পেটের জ্বালা দিয়ে ব'সে আছ।... এই যে বারোটা পর্যন্ত শুকিয়ে রয়েছ, এটাও কি সাধ আমার ?..."

আরো অনেক কথা সব। বলে আর শুকিয়ে-যাওয়া মুখখানি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়ে দিতে থাকে। বলতে বলতে এক

একদিন যখন মনটা উথলে ওঠে, কোঁচার খুঁট চোখে দিতে হয়, তখন মনে হয়, কে যেন পিঠে লুটিয়ে পড়েছে, বলছে—"চুপ কর, তুই যেন আমার চেয়েও অভিমানী আবার। আমি তাহলে যাব চলে লাহাদের কিংবা সাহাদের ওখানে···"

যেন রঙ্গ শুরু ক'রে দেন ঠাকুর। কাঙালী শিউরে উঠে কোঁচা ফেলে দেয় ; ভাঙা মূর্তির দিকে চেয়ে শাসিয়ে বলে—"খবরদার !"

"আমি যাব দেখিস, এই চল্লুম।"

"বলছি যাবে না। জন্মাষ্টমীর মিছিল আসছে ; একে হাত নেই, পা নেই, এর ওপর যদি আরও আচ্ছা ক'রে ছেঁচে দেয় !···"

ঠাকুরের মুখে খিলখিল ক'রে দুষ্টুমির হাসি উঠে, ছ্যাঁচা বেড়ার মাটিলেপা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফেরে। যেন পালিয়ে যেতে যেতে ঘুরে যাওয়া, দাঁড়িয়ে আবার ছোটা। কী যে করবে বুঝে উঠতে পারে না কাঙালী। শুধু কি তাই ?—রূপও লুকিয়ে পড়ছে ভাঙা পাথরের অরূপের মধ্যে। আবার যে কী অপরূপ হয়ে তারই গায়ে উঠছে ফুটে—যেন চোখ ফেরানো যায় না।

তারপর এক সময় সব রূপ, সব হাসি মিলিয়ে যায় স্ত্রী হরিদাসীর ঝাঁঝালো আওয়াজের মধ্যে—"ওগো, হোল তোমার ? কী জ্বালা বাপু ! এক ভাঙা ঠাকুর নিয়েই এই দুপুর গড়িয়ে যায়—আস্ত হ'লে না জানি সে আবার কি অবস্থা হোত···"

"ঐ শোন, শুনছ তো ?—এবার আর আমি নয়।"

কাঙালীচরণ সচেতন হয়ে ওঠে আবার। কাচা হলদে ন্যাকড়াটুকু কোমরে জড়িয়ে দিতে হবে, পিঠে বেঁধে দিতে হবে কোথা থেকে যোগাড় করা রেশমের টুকরোটি,—পীতধড়া, মাথায় ময়ূরের পালকটুকু।

কাঙালীর কেষ্ট থাকেন লক্ষ্মীটি হয়ে দাঁড়িয়ে—যেন হরিদাসীর গলার ভয়ে জড়সড় হয়েই।

অথ নাসিকা কথা

সুদূর মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র রেল স্টেশন। প্লাটফর্ম বলতে বিশেষ কিছু নেই, লাইনের ধারে একসারি পাথরের লম্বা লম্বা ইট পোঁতা, তার ভিতর হালকা করে সুরকি ছড়ানো, তাইতেই যা হয়। সমস্ত অঞ্চলটাই মেঠো আর বিরল-বসতি। স্টেশনের কাছেপিঠে গ্রাম ত নেইই, দূরেও গাছপালার আড়ালে কোথায় কী আছে আন্দাজ হয় না ঠিকমত। তারই মধ্যে একখানির নাম ধরে স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে। গাড়ি সমস্ত দিনে তিনখানি আপ, তিনখানি ডাউন। আমি যাব আপ অর্থাৎ উত্তরে। আসতে, বেশ খানিকটা পথ থাকতেই গাড়ি এসে চলে গেল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রোদ বেশ তেতে এসেছে। প্লাটফর্মের মাঝখানে একটি বেশ ঘনপল্লবিত দেবদারু গাছ, তারই নীচে গিয়ে হোল্ডঅল থেকে শতরঞ্জিটা বের করে পেতে বসলাম।

প্লাটফর্মে লোক আর মাত্র দুজন। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর একটি বছর পনরোর মেয়ে। পালকিতে আসতে আসতে দূর থেকেই চোখে পড়েছিল: ভদ্রলোক একটা কী বিছিয়ে শুয়ে আছেন, মেয়েটি তুলে তুলে তাঁর পা টিপছে। রাস্তার উল্টো দিকেই মুখ করেছিল, একবার ঘুরে আমার দিকে নজর পড়তে ভদ্রলোককে বোধ হয় জানাল। তিনিও ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে উঠে বসলেন।

আমি পৌঁছে গুছিয়ে বসে আলাপ শুরু করে দিলাম। দুঃখের কাহিনী।...ভদ্রলোক নাম বললেন লক্ষ্মীকান্ত বসু। হ্যাঁ, এটি মেয়েই। আসছেন নগাঁ থেকে; ওই যে তিনটে তালগাছ একসঙ্গে মাথা ফুঁড়ে উঠেছে, ওইখানে। না, বাড়ি ওখানে নয়, বাড়ি ওঁদের হল গৈকে, সেও এই রকম স্টেশন থেকে নেমে দু কোশ পথ। পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তারপর গাড়ি যদি লেট করে এল—প্রায়ই লেট থাকে, এই গাড়িটাই টাইমে এসেছিল—কপাল দোষেই বলতে

হবে, ইস্টিশনে পা দিতে না দিতে ছেড়ে দিল—উনি যদি আবার লেট করে আসেন ত চিত্তির। মেঠো পথ, সঙ্গে মেয়ে, কী যে করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না।

ক্লান্ত আর কেমন যেন বেশী রকম মনমরা দেখে আমি সান্ত্বনাচ্ছলে বললাম, "অত ভেবে কী করবেন? এমনও ত হতে পারে আজ টাইমে আসবার পালা আছে।"

একটু ম্লান হাসি হাসলেন ভদ্রলোক, বললেন, "বড় সুযাত্রা করে বেরিয়েছি কিনা, সব শুনলে ওকথা আর বলতেন না। ওই ত বললুম, গাড়ি টাইমে এল, সেও কপাল দোষেই ..."

"কী ব্যাপারখানা—যদি আপত্তি কিছু না থাকে..."

শহরের দিকে হলে প্রশ্নটা মুখে বেধে যেত। ভদ্রলোক একটু ঠোঁটে সেইরকম হাসি নিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন, তারপর জানালেন, "না, আপত্তি কিসের? দুঃখের কথা জানাতেই ত চায় লোকে, শোনবার লোক পেলে হাল্‌কাই ত হয় মনটা। কিন্তু ফল ত নেই, যাকে শোনানো তারও মনটা নাহক ভারী করে দেওয়া, একে ত আমারও গাড়ি টাইমে এসে পড়ায় এই নিগ্রহ...নগাঁয় আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। পাশের গ্রাম চন্দনায় একটি পাত্র যোগাড় করে মেয়েটিকে দেখাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ওদিকে খেতের ফসল তোলার হাঙ্গামায় আর যাওয়া হয়নি—একে সামান্যই, টেনেটুনে বছরটা কোনরকমে চলে, ছেড়ে গেলেই তো পরের হাততোলার উপর নির্ভর—হাঙ্গামা মিটিয়ে নিয়ে এসেছিলুম মেয়েটিকে, তা..."

প্রশ্ন করলাম, "হল না?"

কথাটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, একটু চুপ থেকে যেন গ্রামটার দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, "না হওয়ারও একটা সামঞ্জস্য আছে। এ যেন এগিয়ে দিয়ে—টেনে নেওয়া ভগবানের। তাইত হয় দুঃখ। সব, একরকম ঠিকঠাক হয়ে একটা সামান্য খুঁতের জন্যে গেল ভেঙে—সে খুঁত এমন যে তাতে

আটকাবার কথা নয়। আজ পর্যন্ত খুঁত বলে কারুর মনেই হয়নি, বরং প্রশংসাই পেয়ে এসেছে সবার।”

থেমে গিয়ে ভদ্রলোক একটু অন্যভাবে হেসে মেয়ের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করেই বললেন, “হ্যাঁরে আহ্ন, বলে দোব কি খুঁতটা? না হয় ঘুরেই চা না ওনার দিকে, দেখুন নিজের চোখে।’

মেয়েটি আমি আসা পর্যন্ত মুখটা ঘুরিয়ে দুটি হাঁটু জড়িয়ে বসেছিল, মাথায় আপত্তির একটু ঝাঁকুনি দিয়ে আরও ঘুরিয়ে নিল ওদিকে।

“লজ্জা পেয়ে গেছে।”

একটু হেসেই আমার দিকে চেয়ে বললেন কথাটা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কী যে হোল, চোখ দুটো হঠাৎ ডবডব করে উঠল, তারপর কোঁচার খুঁটটা তোলবার আগেই ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল।

বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমি, বললাম, ‘থাকগে একথা। আমারই ভুল হয়েছে, জানতাম না ত। স্থির হন আপনি।”

চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললেন, “কী যে লজ্জা···আগেকার মতন ন-দশ বছরের মেয়ে নয়ত···খায়নি পর্যন্ত···পেটে বেদনার ছুতো করে··· কোথায় বেদনা তা আমি বাপ হয়ে কি না বুঝে পারিরে পাগলি?··· উফ!”

কী যে করব, কী বলব ভেবে উঠতে পারছি না। উনি ত চোখে কোঁচার খুঁটটা চেপে ধরেছেনই, বেশ বুঝলাম মেয়েটিও স্থির থাকতে পারেনি, চাপা কান্নায় ভেঙে পড়েছে ওদিকে।

একটু নিরুপায়ভাবে চুপ করে থেকে মনে করলাম একটু এগিয়ে গিয়েই না হয় শান্ত করবার চেষ্টা করি গায়ে পিঠে হাত দিয়ে, পাড়াগাঁ-ই ত। উঠতে যাব, এমন সময় স্টেশনের বাইরে হঠাৎ একটু চেঁচামেচি উঠতে সমস্ত ব্যাপারটা আপনিই সামলে গেল।

আমি যে রাস্তা দিয়ে এলাম, সে রাস্তায় আর একখানি ছৈ-দেওয়া গরুর গাড়ি আসছিল। আমরা লাইনের দিকে মুখ করে বসে ছিলাম, লক্ষ্য করা হয়নি, গাড়িটি এসে গিয়েছে এবং চেঁচামেচি সেইখানেই।

প্রথমেই আচমকা যে-কথাটা শুনে আমরা তিন জনেই চকিত হয়ে ঘুরে চাইলাম সেটা হচ্ছে—"আমি হচ্ছি মালীঘরার ডাকসাইটে মিত্তির বাড়ির ছেলে—আমার নাম বংশীধারী—আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী চলবে না !"

চড়া গলা। একটি প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের মোটাসোটা ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরই। ভিতর থেকে একে একে আরোহীরা নেমে আসছে, জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে, উনি এক হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে একটা হাত কোমরে দিয়ে বকে যাচ্ছেন—

"তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে হাত-পা জখম করতে হবে না, গাড়ির ঢের দেরি আছে—নিগ্রহের কসুর হয়নি, এর ওপর আর বাড়াবার দরকার নেই। ট্রাঙ্কটা দুজনে ধরে—দুজনে—মহিম তুমি ভেতর থেকে আংটাটা ধরে আলগে দাও—নাপতে কোথায় গেল ?··· একটু ধর-না সামনে এসে বাবা, পাওনা মারা গেল বলে তোর যে দেখছি···তা বলে ওই মেয়ে ঘরে আনতুম এইটেই ইচ্ছে তোদের ? ···ললিত কোথায় গেল ? ···ও, ছৈয়ের ওদিকে রয়েছে ? না, দেখছি ত, তোমারও মনটা যেন—কী যে বলে···"

গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে দলটা এগুল। বড়র মধ্যে তিনজন, তিনটি যুবা, দুটি বছর বারো-তেরোর ছেলে, একটি আরও ছোট, একজন নামাবলী গায়ে বামন-পণ্ডিত আর একজন নফর গোছের। হাতে টোপর দেখে মনে হল নাপিত, আর উনি পুরুত, আর সমস্ত দলটি বরযাত্রীর দল।

ভদ্রলোক চেঁচাতে চেঁচাতে আসছেন—"হল নিগ্রহ, কিন্তু দোষটা কার ? গোড়াতেই যদি দেখিয়ে দেয় এই আমাদের মেয়ে···নাও ওখানটায়ই বোস, বেশ ঠাণ্ডা আছে, হীরু, কম্বল দুটো বিছিয়ে দে··· আপনাদের অসুবিধে হবে ?"

এসে পড়েছেন গাছতলাটায়। বললাম, "না, অসুবিধে কিসের ?

জায়গা ত যথেষ্ট রয়েছে। বরং এদিকটায় এসে বিছুতে বলুন, রোদ এসে পড়বে। কোন্ দিকে যাবেন ?”

“আপের গাড়ীর ত দেরি আছে এখনও ? আজগুবি দেশ মশায়, কোন্ গাড়ি কখন আসবে, ওদিকে মেয়ের বাপ যে সাধু কি ধাপ্পাবাজ দাঁড়াবে—কিচ্ছু হদিস পাওয়ার জো নেই এ-দেশে।”

বললাম,—“দেরি আছে ··বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন ?”

“নিয়ে যাচ্ছি মানে !’—হীরু নাপিত কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে, সবাই বসেছে, উনি বসতে গিয়ে হঠাৎ উগ্রভাবে আমার দিকে চেয়ে থেমে গেলেন, তারপর হাতের ভরে ভারী শরীরটা নামিয়ে দিয়ে সেই ভাবেই বলে চললেন, “নিয়ে যাচ্ছি কী বলছেন আপনি ? বিয়ে ভেঙে দিয়ে ফিরে আসছি।···এইত হয়েছে, আপনি একজন বাইরের লোক, কোনদিকে টেনে বলবার আপনার কোন স্বার্থ নেই, আপনি নিরপেক্ষ-ভাবে বলুন···তার আগে আমার মুখটা ভাল করে দেখে নিন একবার দয়া করে।”

ভদ্রলোক সোজা আসনপিঁড়ি হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেন দেখানো এভাবে, কী উদ্দেশ্যে, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে দেখে বললুম, “মুখ ত দিব্যিই দেখছি।’

ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, “কিন্তু নাক কোথায় মশায় ? কুশ্রীর বংশ নয় মালীঘরার মিত্তিররা, কিন্তু নাক কোথায় ? এই নাক (হাত বুলিয়ে) তুদিকে গালের সঙ্গে প্রায় মিশে এলো বলে—বাবার, তাঁর আগে ঠাকুদ্দার অয়েল রয়েছে বৈঠকখানায় টাঙ্গানো, দেখলে মিলিয়ে দেখতেন পুরুষানুক্রমে কী রকম নেমে আসছে, ওর ওপর আমি যদি আবার এক খাঁদা মেয়ে ঘরে ঢোকাই··· আপনি ওর নাকটাও তা হলে দেখে নিন একবার···সাধন ! একবার ফিরে চাও এদিকে।”

আর ও-মেয়েটির মত নয়। তিনজন যুবকের মধ্যে মাঝেরটি

সুবোধের মতো আস্তে আস্তে তুলছিলই মাথা, আর-একটা ডাকে সোজা করে তুলে আমার মুখের দিকে চাইল। বেশ নরম কচি মুখখানি, গৌরবর্ণ, টানা-টানা চোখ। নাকটা ভদ্রলোকের ধাঁচেই, খানিকটা চাপা ; তবে তাতে তাঁকেও যেমন কুৎসিত করেনি তেমনি একেও করেনি। ঈষৎ-লজ্জিত, হয়ত একটু কাতরও, মিষ্টি মুখটার ওপর দৃষ্টিটা আটকে গিয়েছিল, ভদ্রলোকের প্রশ্নে লজ্জিত হয়ে উঠলাম, "দেখলেন ত ?··· আমার ছেলে, এরই বিয়ে দিতে এসেছিলুম। দেখলেনই ত আমার চেয়েও এক ডিগ্রি নেমেছে। এখন আপনিই বলুন, যদি এখনও সাবধান না হওয়া যায়, এই বোঁচার স্কন্ধে আর এক বুঁচি এনে···

"তা বলে ভেঙ্গে দিয়ে আসা একেবারে···না এগুলেই ত ভাল ছিল।"

ওঁর কথাগুলো সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল রাগের মাথায় ; তা ভিন্ন আমার সামনেই চেহারার খুঁত নিয়ে ঠিক ওই ধরনের এক ট্রাজেডী, মনটা খিঁচড়ে এসেছে, একটু বিরক্তভাবেই কথাটা বলে থাকব, বংশী-ধারীবাবু একটু যেন দমে গেলেন। তারপর—"আপনিও তা হলে···" বলে আবার পূর্ববৎ খাপ্পাই হয়ে উঠলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়ে আসতে হল ভেঙে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর না বের করলে চলে ? তোমার খাঁদা মেয়ে তা সে কথা লুকিয়ে ওরকম ধাপ্পা দেওয়ার দরকার কী ? ওই মহিম রয়েছে, ছেলের মামা, ও ত মিছে কথা বলবে না। যখন মেয়ে দেখতে এল—ও আর ওই ললিত এসেছিল—বলুক ওরা। দিব্যি নাকওলা মেয়েই ওদের দেখায়নি তখন ? কি গো ললিত ?"

সমস্ত দলটি স্বভাবতঃ ঝিমিয়ে গিয়েছে। মহিম আমার দিকে চেয়ে একটু ভগ্নকণ্ঠেই বললেন, "আমাদের ত অন্য মেয়েই দেখিয়েছিল। তঞ্চকতাটুকু না করলেই হত।"

ললিত একটু আড়ে চেয়ে বললেন, "রাত্তিরে দেখা, অনেক দিন হলও, অত মনে নেই। তা হয়ই যদি ত এ-মেয়েও পড়ে থাকবার নয়।"

"শুনুন। ললিত আমার ওপর চটেছে। পড়ে থাকবার কথা হচ্ছে কী ? কিন্তু···সাধন, আর একবার ঘুরে চাও।"

একবারেই হুকুম তামিল করবার মত কড়া গলা এবার, সাধন এবার আর ইতস্ততঃ না করে ঘাড়টা তুলে সোজাসুজি চাইল আমার দিকে। বংশীধারীবাবু বললেন, "আমার কাছে ত তঞ্চকতা নেই, বেশ ভাল করে দেখে নিন ওই ধাপ্পাবাজির মধ্যে পা বাড়িয়ে দিলে কী সর্বনাশই ডেকে আনা হত। একটা গোটা বংশ, সব আছে, নাক নেই, নেমে যেতে যেতে বিলকুল লোপাট! ভাবতে পারেন?"

ললিত একটু বিরক্ত হয়েই মুখটা ঘুরিয়ে বলল, "যদি হত সর্বনাশ—যেমন তুমি বলছ—চীনেরা জাপানীরা যখন টিঁকে আছে তোমার বংশও থাকত টিঁকেই—ভালভাবেই টিঁকে, তাদের তুলনায় সাধন তোমার ত খগরাজ গরুড় বলতে হবে।"

"শুনে রাখুন মশায় কথাটা!···সাধন! অত অবাধ্য হয়েছ কেন? খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে রাখতে কী হয় মুখখানা?"

এতক্ষণ হুকুমই ছিল, এবার রীতিমত রাগ। সাধন আবার ফিরে চাইলে বললেন, "না গোমড়াপানা করবে না মুখ, তাতে নাকে ইতর-বিশেষ হয়ে ধোঁকায় ফেলতে পারে ওঁকে।···এইবার দেখুন মশায় ভাল করে। ললিতের ওটা রাগের কথা হল না? এই ছেলেকে খগরাজ গরুড় বলতে হবে?···আর তাই মনে করে মালীপাড়ার মিত্তির বংশের ছেলে আমি—একজন ধাপ্পাবাজি করে তার খাঁদা মেয়েকে যে গছিয়ে দিতে চাচ্ছে···তা, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে···"

একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসেই বললাম, "কিন্তু যাদের একেবারে ঘাড়ে কুড়ুল পড়ল···'"

"পড়তে পারল কোথায় মশায়? টাকার জোর আছে, আগে বোধ হয় কথাও হয়ে নাকের জন্যে ভেঙে গিয়ে থাকবে। পাশের গ্রাম থেকে সেই পাত্র আনিয়ে···"

"তা আপনিও না হয় খাঁইটা বাড়িয়ে দিতেন, এমন একটা দাঁও···"

মনটা ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম কাজ কী পরের কথায় যাব না। কিন্তু ক্রমেই ভদ্রলোককে ব্যাপারটা তিক্ত

করে তুলতে দেখে মনে হল, তা হলে ভাল করেই মিষ্টি মিষ্টি ত্ন কথা শুনিয়ে ঠাণ্ডা করে দিই। কিন্তু এই সময় একটা ব্যাপার হতে মাঝপথেই থেমে যেতে হল।

লক্ষ্মীকান্তবাবু এতক্ষণ মুখটা একেবারেই ওদিকে করেছিলেন, আঘাতটা একেবারে সোজাসুজি গিয়ে পড়ছে ত, আমার এই ভাব-পরিবর্তনে ঘুরে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সব ছেড়ে আমার দৃষ্টিটা একেবারে ওঁর নাকের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল—যা এতক্ষণ মোটে খেয়াল করিনি।

মুখটি একটু শুকনো এবং সে তুলনায় নাকটি বেশ বড় এবং বর্তুল। মনটা বংশীধারীবাবু থেকে একেবারে ওঁদের দিকে গিয়ে পড়ল,—এই বাপের মেয়ে যখন তখন এখানেও দেখছি নাকেরই ট্রাজেডি—ওদিকে স্বল্পতায়, এদিকে বাহুল্যে।

তা হলে কিন্তু কোন্‌দিকে যায় মানুষ ?

সমস্যাটা একটি বিষণ্ণ প্রশ্নে ঘনিয়ে উঠছে মনে, এমন সময়ে নিশ্চয় হঠাৎ সব কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই এতক্ষণ পরে মেয়েটিও ঘুরে চাইল।

চোখ যেন জুড়িয়ে গিয়ে মনের সব জ্বালা কোথা দিয়ে গেল নেমে। তুর্লভ মুখ একখানি। টানা-টানা বিহ্বল চোখ, চাপা ঠোঁট। বিশেষ করে নাকটি। পুরন্ত গোলছাঁটের সুডৌল মুখে বাপের ওই নাকই তার পরম বর্তুলতা হারিয়ে কী বাহার করে ঠোঁটের কাছাকাছি পর্যন্ত যে নেমে এসেছে, যেন চোখ ফেরানো যায় না।

দেখা অবশ্য আধ মিনিটও নয়, ফিরিয়ে নিয়েছে মুখটা। আমি কিন্তু মন স্থির করে ফেলেছি—আর অপ্রীতিকর কিছু করা নয়। হেসেই মিষ্টি মিষ্টি করে "দাঁও"-এর কথা বলতে যাচ্ছিলাম বংশীধারী-বাবুকে, সেই হাসিটাকে মোলায়েম আর রুচিকর করে নিয়ে বললাম, "না, রাগ করবেন না বংশীধারীবাবু, দাঁও মারাটা তুনিয়ার চাল হয়ে গেছে বলেই বলছিলাম, মালীঘরার মিত্তির বাড়ির সন্তান যে তাতে নামবেন না এটা জানাই। তবে…"

হাসিটা আরও বড় করে দিয়ে চুপ করে গেলাম।

ভাব ও ভঙ্গিমার একবারে দিক পরিবর্তনে সবার দৃষ্টি এদিকে এসে পড়েছে, বংশীধারীও একটু হকচকিয়ে গিয়েছেন, বললেন, "বলুন, কী বলছেন, থেমে গেলেন কেন?"

একটু শব্দ করেই হেসে বললাম, "কিন্তু মিত্তির বংশের মর্যাদা কঠোর পরীক্ষার সামনে, আগে থাকতেই বলে রাখছি, মাফ করবেন। বলছিলাম, সত্যিই নাকের জন্যেই এত হচ্ছিল কী? তা হলে আমি এমন বাঁশির মত নাক দিতে পারি—এখনই—এখানেই..."

"কোথায়—চলুন—কথা দিচ্ছি আপনাকে।...কিন্তু এখানে কোথায়? .."

লক্ষ্মীকান্তবাবুর বিস্ময় বিমূঢ় চোখদুটির উপর দৃষ্টি ফেলে বললাম, "আদু মাকে একটু ঘুরে বসতে বলবেন না?...নামটিও বোধ হয় আদরিণী?"

একটু আশঙ্কারই ছিল, অভাব থেকে একেবারে অতিরিক্ত ত। কিন্তু ততক্ষণে লক্ষ্মীকান্তবাবু উঠে পড়েই ঘুরিয়ে বসিয়েছেন কন্যাকে।

একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন বংশীধারীবাবু। নামটা জেনে নিয়েছেন আমার, ব্রাহ্মণ জেনে ছেলেকে আর ভাবী বধূকে প্রণাম করিয়ে নিয়েছেন। বলছেন, "যাত্রা অশুভ বলছিলাম শৈলেনবাবু? এমন শুভযাত্রা জীবনে আসেনি। একটা বংশের গোটা ধারাটাই বদলে গেল—চার পুরুষ ধরে কি সর্বনাশের পথে যে নেমে চলেছিল। বরং দেখে নিন আর একবার? বিশ্বাস না হয়ত।...সাধন!..."

কী যে করবেন, কী বলবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। সমস্ত দলটিও যেন কোন এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে। সাধনকে নিয়ে তার বন্ধু দুজন স্টেশনঘরের আড়ালে কোথায় ওদিকে চলে গেল।

কিন্তু মালীঘরার খামখেয়ালী সন্তান, আর, এ-নাকের চেয়ে আরও ভাল নাকের অভাবও ত নেই সংসারে, ব্যাপারটা জুড়ুতে দেওয়া সঙ্গত

মনে করলাম না, বললাম, "শুভযাত্রাই যখন এত, তখন হাতছাড়া করার দরকার কী মিত্তির মশাই? ভাল নাক একটা দুর্লভ ত সংসারে; দেখলেনই ত খুঁজে।"

পুরুতমশাইয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, "আর দিনটিন আছে সামনে পণ্ডিত মশাই?"

কেন জানি না, একটু হাসলেন, বললেন,—"একটা ত কালই, এমাসে ওই শেষ, তারপর একেবারে বোশেখের মাঝামাঝি।"

শিউরে উঠলেন বংশীধারী, "অত দেরি? সর্বনাশ! আরে অত দেরি করতে আছে? কালই।...অবিশ্যি বেহাইয়ের যদি আপত্তি না হয়.. "

আশায় আনন্দে তার সঙ্গে ভয়ে, অদৃষ্টের উপর অবিশ্বাসে কী রকম হয়ে গিয়েছেন লক্ষ্মীকান্তবাবু, হাত দুটি একত্র করে বললেন, "আজ্ঞে আমায় যখন আদেশ করবেন। গরিবের আয়োজন, তার জন্যে..."

গাড়ি আসার ঘন্টি পড়ল। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বংশীধারী "তা হলে মহিম, তুমি এই গাড়িতে ফিরে যাও, ভোরের থাকতে বলোগে বাড়িতে। আর দ্যাখো, বরযাত্রী যারা অমন করে গা-ঢাকা দিলে সবাইকে আবার ধরে নিয়ে আসবে—কাল সকালের গাড়িতেই।"

মহিমবাবুকে বললাম, "চলুন, সাথী হব খানিকটা পথ .."

অনেকক্ষণ কেটেছে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলাম, লক্ষ্মীকান্ত বাবু ডান হাতটা চেপে ধরলেন, চোখে জল এসে গিয়েছে। বললেন, "আপনি যাবেন? সে হতেই পারে না। দুটো দিন..যতই কাজ থাক আপনার—শুধু দুটো দিন..."

আরও আপত্তি করে উঠলেন বংশীধারী নিজে, "আপনি যাবেন মানে! ঘটক, আপনি হলেন এযজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর, আপনাকে কে যেতে দিচ্ছে।"

একটু ক্ষতি হবে আমার। কিন্তু ওই কথা, মালীঘরার মিত্তির বংশের খেয়ালী সন্তান, আর এই নাকের পর আর নাক নেই এমনও ত বলা যায়না—আজ থেকে কাল পর্যন্ত সময়।

হেসে আবার বসেই পড়লাম।

দৃষ্টান্ত

"শুধু চোখ দুটি খুলে রাখতে হবে, মনকে করে রাখতে হবে সজাগ, তাহ'লেই দেখতে পাবে প্রকৃতিদেবী আমাদের কল্যাণের জন্যই যেন চারিদিকে নানা উদাহরণ ছড়িয়ে রেখেছেন। সামান্য এক পিঁপড়ের কথাই ধরো না, যাকে আমরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র আর নগণ্য মনে করি। কী কঠোর আর অনলস পরিশ্রম! সমস্ত দিনে রাতে এতটুকু বিশ্রাম নেই। নিদ্রার কথা তো ছেড়েই দাও। ক্রমাগত আহারের সন্ধানে, কী নিজের বাসস্থান তৈয়ের ক'রতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আর কি সঙ্ঘবদ্ধতা! একটি যদি খাবারের টুকরো দেখলো যেটা একলা নিয়ে যেতে অক্ষম তো অমনি ছুটল সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে আসতে, দলবদ্ধ হ'য়ে সেটাকে টেনে-টুনে, ঠেলে-ঠুলে যাবেই নিয়ে বাসায়। সেখানে আছে ওদের গুদাম ঘর, জমা করে রাখবে। তাহলে ঐ নগণ্য পিঁপড়ের মধ্যে আরও একটা গুণের সন্ধান পাচ্ছি আমরা, সঞ্চয়শীলতা। বেশ, এই পরিশ্রম আর সঞ্চয়শীলতার আরও উদাহরণ কোন দিতে পার ?"

"মৌমাছি, স্যার।"

"ঠিক; মৌমাছি! কোথায় ফুল ফুটেছে, তার মধ্যে কোথায় একটু মধু আছে, উড়ে উড়ে সংগ্রহ ক'রে নিজেদের চাকে এনে জমা ক'রছে। সংগ্রহ একেবারে একটি বোধ হয় সূচের মুখে যতটুকু লেগে থাকতে পারে, কিন্তু নিরন্তর আর সংঘবদ্ধ পরিশ্রমে সমস্ত চাকটি ভরে যাচ্ছে। শিক্ষা দেওয়ার মতন মৌমাছির আরও কিছু দেখতে পেয়েছ তোমরা ?"

"হুল, স্যার। একবার যদি ফোটাতে…"

সমস্ত ক্লাশটায় খুক্ খুক্ করে একটি শব্দ উঠতে যাচ্ছিল। মাস্টারমশাই কড়া চোখে একবার মাথাটা ঘুরিয়ে আনতে আবার চুপচাপ
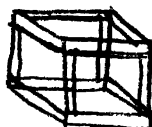
হয়ে গেল। বললেন—"খুব যে ভুল বলেছে এমন নয়। পরের সঞ্চিত ধন যদি আমরা লোভের বশীভূত হ'য়ে আত্মসাৎ ক'রতে যাই তো সেটা একটা অন্যায়, এবং সে অন্যায়ের সাজা আছে—"

"কিন্তু যদি স্যার, কম্বল মুড়ি দিয়ে—"

আবার খুক্-খুক্ করে হাসি। আবার সেটা দাবিয়ে দিলেন মাস্টারমশাই ঐ ক'রে। বললেন—"বেশ, পরিশ্রম, সংঘবদ্ধতা আর সঞ্চয়শীলতার শিক্ষা আমরা পেলাম পিঁপড়ে আর মৌমাছির কাছে। এবার অধ্যবসায়ের কথায় আসা যাক। তোমরা রবার্ট ব্রুসের গল্পটা শুনেছ—কেমন ক'রে তিনি এক সামান্য মাকড়সার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে অধ্যবসায়ের গুণে নিজের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন?"

সবাই চুপ করে রইল।

"রবার্ট ব্রুস্ ছিলেন স্কটলণ্ডের রাজা। তাঁকে নিজের রাজ্যের জন্যে বহুদিন ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লেগে থাকতে হয়, আর বারবারই তিনি পরাস্ত হতে থাকেন। কিম্বদন্তী এই রকম যে, রাজ্যচ্যুত হয়ে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, এই সময় একটি গুহার মধ্যে অবস্থানকালে একটি দৃশ্য তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। দৃশ্যটি হচ্ছে, একটি মাকড়শা নিজের তন্তু ধরে গুহার ছাতে পৌঁছুবার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রতিবারেই খানিকটা উঠে আবার তন্তুটা ছিঁড়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। তখন বারছয়েক ইংলণ্ডের কাছে পরাজিত রবার্ট ব্রুস, যুদ্ধের সংকল্প ছেড়েই দিয়েছিলেন নিরাশ হয়ে। মাকড়শার অধ্যবসায় দেখে বুকে বল বাঁধলেন। মাকড়শারও ছ'ছবার হয়ে গেছে তখন, আবার ওঠবার চেষ্টা ক'রছে, ব্রুস্ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। এবার মাকড়শাটা কৃতকার্য হয়ে উঠে পড়ল ছাতে। ব্রুসের মনে একটা নতুন উদ্দীপনা এল, ভাবলেন, সামান্য একটা কীট মাকড়শা, সেও যদি শুধু অধ্যবসায়ের গুণে নিজের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তো আমি মানুষ, আমিই বা পারব না কেন? আবার নতুন ক'রে শক্তি সঞ্চয় ক'রে তিনি নামলেন শত্রুর বিরুদ্ধে, আর বিখ্যাত ব্যানক্বার্ণের

যুদ্ধে তাকে পরাস্ত ক'রে আবার নিজের রাজ্য অধিকার করলেন।"

মর‍্যাল লেশন্ অর্থাৎ নীতিশিক্ষার ক্লাশ, হেডমাস্টার নিজে নেন সপ্তাহে একবার করে। ঘণ্টি বেজে ক্লাশ শেষ হোল। উঠে গেলেন হেডমাস্টার। দিনকতক উদাহরণ খোঁজার একটা হুড়াহুড়ি পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে।

রবিবার, সন্ধ্যা উতরে গেছে। নিজের ঘরে গোটানো বিছানায় মাথা দিয়ে চৌকির ওপর গা এলিয়ে পড়েছিল সন্দীপ, দু' ক্রোশ দূরে স্কুলের টীমের হয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল, একটু আগে ফিরেছে। প্রতিপক্ষ ছিল প্রবল, সর্বাঙ্গে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছে। ছোট বোন ছানা আলো নিয়ে আসতে তাকে দিয়ে খানিকক্ষণ হাত-পা টেপালো পেয়ারা পেড়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে। বাড়ির মাস্টার আসতে ছানা চ'লে গেল, একলাই প'ড়ে আছে সন্দীপ।

ওর-ও এইবার উঠে পড়ার টেবিলে বসা দরকার। রবিবারটা ফুটবলের হিড়িকেই কেটে গেল, কালকের কোন টাস্কই হয় নি। অঙ্কের টীচার বিরাজবাবু গেমস্-এর (Games) সেক্রেটারি, না হয় বুঝবেন, চিন্তা হচ্ছে প্রবন্ধের ক্লাশ নিয়ে! প্রবন্ধ রয়েছে বাংলার টীচার রামগতি পণ্ডিতের হাতে। অত্যন্ত কড়া লোক। আগেকার আমলের সাজাগুলা একমাত্র উনিই চালু রেখেছেন এখনও। অন্য সবার ক্লাশে একটা ভুল হ'লে পনরো-বিশবার সেটা লেখা, রামগতি পণ্ডিতের ক্লাশে পঁচিশবার ক'রে লেখা তো আছেই, তার ওপর তিনটে ভুলে এক ঘা ক'রে বেত, হাত পেতে নিতে হবে। রামগতি পণ্ডিত বলেন, পঁচিশবার লেখায় মনের ভুল কাটল, হাতেও তো ওষুধ চাই। নমুনা এই।

সবচেয়ে পুরনো শিক্ষক স্কুলের; হেডমাস্টার, স্কুলের সেক্রেটারী তার ছাত্র, এদিকে সন্দীপের দাদা, কাকা আর তাঁদের বয়সের লোকেরাও।

রামগতি পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অ্যাপীল নেই। শুধু ম্যাট্রিক ক্লাশটায় নতুন নিয়ম-কানুন কতকটা মেনে চলেন। সে নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাতে এখনও পুরো এক বছর। সাজাটা আবার আগে হাতে পেতে নিতে হবে, তারপর সেই হাতে-লেখা। একেবারে টাস্ক না নিয়ে গেলে ওঁর কোডে (code) কোন বাঁধাধরা সাজা নেই, মর্জির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কী যে হবে ভেবে পাচ্ছেনা সন্দীপ। উনি আবার ফুটবল ক্রিকেটের ওপর ভীষণ চটা, এসব তুলে দিয়ে কপাটি, চিকে—এইসব খেলা প্রবর্তনের পক্ষপাতী।

এমন ক্লান্তি, এমন একটা অবসাদ যে পরিণাম বুঝেও শরীরটাকে চাড়া দিয়ে তুলতে পারছে না সন্দীপ। ঘরের কোণে ছাতের কাছটায় একটা মাকড়শা নানারকম উদাহরণ সৃষ্টি করে কর্মে উদ্দীপিত করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু এক আজকের ম্যাচে হেরে যাওয়া ছাড়া ব্রুসের সঙ্গে কোনও সাদৃশ্যই এনে ফেলতে পারছে না।

এই সময় নীচে হঠাৎ অন্য একটা উদাহরণে দৃষ্টিটা আটকে গেল সন্দীপের। নতুন নয়, আখছারই দেখা যাচ্ছে, তবে বর্তমান সমস্যাটার ওপর একটা যেন নূতন আলোকপাত ক'রতে পারে ব'লে মনে হচ্ছে।

একটি টিকটিকি একটা পোকা ধরবার চেষ্টা করছে; টেবিলের লণ্ঠনের আলোয় চারিদিকে যেগুলা এসে জুটেছে, তার একটির ওপর আপাততঃ বিশেষ লক্ষ্য, যেহেতু সেইটিই সবচেয়ে বড়।

নিত্য দেখা দৃশ্য বা দৃষ্টান্ত, মনোযোগটাই স'রেই যেত ও-থেকে, কিন্তু আগোছালভাবে রাখা বই খাতা দোয়াতদানি চায়ের কাপের মধ্যে শিকার-শিকারীর লুকোচুরিতে হঠাৎ একটা পুরনো কথা আবার নতুন ক'রে মনে পড়ে গেল।

দাদা সঞ্জীবের বাংলা প্রবন্ধের খাতাটা!

সঞ্জীব ছিলেন খুব গোছালো। স্কুলের অনেক নীচু ক্লাশ থেকে শুরু ক'রে কলেজের এম-এ পর্যন্ত কোর্সের সমস্ত বই-খাতা ওঁর মজুদ। পাঠ্যতালিকা, পদ্ধতি এখন সবই বদলেছে, অন্য কিছুরই

আর প্রয়োজন নেই তেমন, তবে প্রবন্ধতো অপরিবর্তিতই। অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে ওঁর খাতাগুলা খুঁজে বের করি, কিন্তু আজ পর্যন্ত পেরে উঠেনি। ভালো ছেলে ব'লে সঞ্জীবের নাম ছিল, আর তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন, সেও আজ বারো বৎসরের কথা। পাওয়া গেলে মস্ত বড় একটা সমস্যা মিটে যেত। হামেশার জন্যেই।

নজরটা টিকিটিকি আর পোকাটার দিকে আটকে আটকে যাচ্ছে চিন্তার মাঝে মাঝে। বইয়ের গাদার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে পোকাটা—টিকটিকিটা একটু থেমে গিয়ে যেন চিন্তা ক'রল, তারপর ঘাড় উঁচু করে দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল—একটা খর্‌খর্‌ শব্দ হচ্ছে, ধরে ফেলল নাকি পোকাটাকে?—না, এদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে পোকাটা, চায়ের যে ডিস্‌টা রয়েছে, এবার তার নীচে, উল্টো দিকে এসে আত্মগোপন ক'রল। সেই খরখরানিটা রয়েছে—থেমে যাচ্ছে, আবার উঠছে, খোঁজাখুঁজি ক'রছে টিকটিকিটা। আবার ঐ পথেই এল বেরিয়ে, ঘাড় উঁচু করে দেখছে টেবিলের চারিদিকটা যেখানে যেখানে নজর যায়। অন্য কোন পোকার দিকে নজর নেই একেবারে।

এতটা তন্ময় হয়ে খুঁজেছে কি কখন সন্দীপ? ঘাড়তোলা অভিনিবিষ্ট টিকটিকির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।—অনেকবার হয়তো অনেক পোকাকে বাঁচিয়েও দিয়েছে। আলো জেলে রাত্রে পড়ার মাঝে ওটা এক ধরনের খেলাই, আজ কিন্তু ও নিজেও টিক-টিকিটার দিকেই।...এক একবার ইচ্ছা পর্যন্ত হচ্ছে পোকাটাকে পেন্সিল কলমের খোঁচা দিয়ে বেরই ক'রে দিক না হয় তার গোপন আশ্রয় থেকে। কিন্তু আলস্যটা লেগে রয়েছে। তা ভিন্ন ওরকম কিছু করতে গেলে টিকটিকিটা যাবে পালিয়ে আগে। পড়েই রইল সন্দীপ।

কিছু ক'রতে হোল না। অনেকক্ষণের নিরাপত্তায় পোকাটিকে অসতর্ক ক'রে দিয়ে থাকবে, আলোর আকষণ সামলাতে না পেরে বেরিয়ে পড়ল। এবার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, টিকটিকিটা একেবারে ঝাঁপিয়ে

পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরে একটা পাক দিয়ে বইয়ের গাদার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুহূর্তেই সমস্ত আলস্য দেহমন থেকে ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়ল সন্দীপ। নূতন উৎসাহে খাতাটার খোঁজে লেগে গেল। চৌদ্দ পনরো বছরের ব্যাপার, এর মধ্যে কত কি হয়েছে, বাড়ি মেরামত, বিবাহ, পূজা প্রভৃতি উপলক্ষে আসবাব-পত্র ঠাঁই-নাড়া করতে হয়েছে, বই খাতা সব নামিয়ে আবার নূতন ক'রে তুলে রাখতে হয়েছে। সঞ্জীবেরই ঝোঁক ছিল এদিকে, তিনি বাইরে চাকরি নেওয়ায় বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে রাখাও হয়নি, ফলে সব অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন খুঁজতে গেলে দেখা যায় বি-এ'র মোটা বইয়ের পাশে হয়তো সেই আগেকার স্কুলের রয়েল রীডার বা একটা পাটিগণিত, এম-এ'র বাঁধানো নোট্‌সের খাতার সঙ্গে টেলিগ্রাফের ফর্‌মে একটা রাফ কপি। এক ঘরেও তো নেই আর। নাড়াচাড়ার হিড়িকে সবগুলা আলমারি বা র‍্যাকে গিয়েও ওঠেনি আর, কতকগুলা বস্তাবাঁধা হয়ে পূজার ঘরের দেয়াল আলমারিতে আশ্রয় নিয়েছে, কতকগুলা হয়ত আলগাই পড়ে আছে ভাঁড়ার ঘরে তাকের ওপর। কয়েকবারই ঝোঁক ক'রে খুঁজেছে সন্দীপ, কিন্তু মাঝপথেই উৎসাহ ভেঙে গেছে।

এবার কিন্তু ছাড়ল না, এবারের মতো বোধ হয় কঠিন তাগিদেও পড়েনি এর আগে, তা ভিন্ন এবারের মতো হেডমাস্টারের মর‍্যাল লেশন এবং তার পরেই টিকটিকির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিল না।

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক গেল। তার মধ্যে পেল ও দুখানা প্রবন্ধের বই, কিন্তু দুখানাই ইংরাজীতে লেখা আর কলেজ ক্লাশের। ইংরাজীও শক্ত, তাছাড়া প্রবন্ধের বিষয়ও অন্য ধরনের, সাধুতা বা অধ্যবসায়, বা রেল-স্টীমার ভ্রমণ জাতীয় কিছু নয়। লেগেই রইল তবু, তবে বেশ বুঝছে উৎসাহটায় ভাঁটা পড়ে আসছে। এই সময় হঠাৎ খাতাটা পাওয়াও গেল অদ্ভুতভাবে। অনেকটা যেন পোকাটা আপনি এসে টিকটিকির মুখে পড়ার মতো।

এদিকে শেষ ক'রে ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ ক'রতে যাবে, রাঙী বেড়ালটা তাকের ওপর ইঁদুর ধরবার জন্য ওৎ পেতে ব'সে ছিল, একটা দেখতে পেয়ে লাফাতে যেতেই, কিংবা সন্দীপকে দেখে পালাতে যেতেই গায়ের ধাক্কা লেগে একটা বস্তা প'ড়ে গেল এবং বই খাতাগুলা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

তুলে দেখতে গিয়ে প্রথমেই হাতে পড়ল সন্দীপের সেই বহু-অভীপ্সিত প্রবন্ধের খাতাখানি। তাও কপাল জোরে একেবারে এই ক্লাশেরই কি হ'তে হয়!

উল্লাসে বুকে চেপে ধরল খাতাখানিকে। তারপর তখনই পড়ার ঘরে গিয়ে কালকের প্রবন্ধটা খুঁজে বের ক'রে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে অবিকল নকল ক'রে নিল। প্রবন্ধও কী উঁচু দরের! শেষ ক'রে কিছুক্ষণ যেন অভিভূত হয়েই চুপ ক'রে বসে রইল। সাফল্য এত অদ্ভুতভাবেও আসে জীবনে!

পরদিন রামগতি পণ্ডিতও প্রবন্ধটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। সন্দীপ বেঞ্চের ওপর থেকে একদৃষ্টে ওঁর দিকে চেয়ে দাঁতে নখ খুঁটছিল, বেশ বুঝল ওঁর এই চুপ করাটা ছাত্রের লেখা দেখে পুলকে অভিভূত হয়ে পড়া নয়। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রছিল, বজ্রনির্ঘোষে ডাক দিতে আস্তে আস্তে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সন্দীপ।

"এ প্রবন্ধ তোর লেখা?"—প্রশ্ন করলেন রামগতি পণ্ডিত।

"আজ্ঞে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।"

"ওটা 'ইতি গজ' গোছের সত্যি কথা হোল। লেখা নিশ্চয় তোর। আমি জিগ্যেস করছি—নিজের মাথা থেকে বেরিয়েছে, না নকল করা?"

চুপ ক'রে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল সন্দীপ মুখের পানে। "আমি যদি বলি এ প্রবন্ধ আমার, সঞ্জীবকে যখন বাড়িতে পড়াতাম লিখিয়ে মুখস্থ করিয়ে নিয়েছিলাম। নমুনা হিসাবে যে লেখা কটা লিখিয়েছিলাম এটা তার মধ্যে একটা—"

চুপ ক'রেই রইল সন্দীপ, ফ্যাল ফ্যাল চোখ দুটা শুধু আরও খানিকটা বিস্ফারিত হয়ে প'ড়েছে।

"কিছু বলবার আছে?"

—বলবার সব অবস্থাতেই মানুষের কিছু থাকেই, এরকম চরম অবস্থাতে বরং বেশিই থাকে, জীবন মরণের ব্যাপারই তো। কিন্তু একেবারেই বাকরোধ হয়ে গেছে সন্দীপের।

চেয়েই রইল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে।

রামগতি পণ্ডিত এসেই আগে ড্রয়ার খুলে বেতটা বের ক'রে রাখেন; তুলে নিয়ে বললেন—"হাত পাত।"

রামগতি পণ্ডিতের পেনাল কোডে একেবারে টাস্ক না নিয়ে আসার সাজার কোন সীমা নির্দেশ করা নেই। তার ওপর এই প্রবঞ্চনা; বেতটা মনে ক'রে থাকবে—জন্ম সার্থক হোল আমার এতদিনে।

এরও কিছু দৃষ্টান্ত ছিল, শুধু যথাসময়ে নজরে পড়ে নি।

মনটা ভালো নেই। স্কুল থেকে এসে আজ আর ফুটবলের মাঠে যায় নি সন্দীপ। জলটল খেয়ে চৌকিতে চিৎ হয়ে ছাতের কোণে মাকড়সার গতিবিধি দেখছিল, একসময়ে কি মনে হোতে উঠে প'ড়ে টেবিলের বইগুলা গোছাতে লাগল। বড় অগোছালো হয়ে রয়েছে।

এক থাক থেকে গোটা চারেক বই সরাতে ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে পড়ল। সেই টিকটিকিটা। মরে প'ড়ে আছে। মুখের মধ্যে সেই পোকাটা। প্রায় সমস্তটাই সেঁধিয়ে রয়েছে। মরেও গেছে সেটা।

কৌতূহল হ'তে কলমের নিব দিয়ে টেনে বের ক'রল সেটাকে সন্দীপ।

কাল লণ্ঠনের আলোয় চৌকি থেকে দেখেছিল আর সব পোকার চেয়ে একটু বড়। আজ দিনের আলোয় কাছ থেকে দেখে মনে হোল হয়তো খানিকটা বিষাক্তও। মাথাটা বেশ চিকচিকে কালো, আর দাড়া দুটাও সাঁড়াশির মতো বাঁকা আর বেশ শক্ত।

"রিয়েলিস্টিক" (Realistic)

রাত্রি প্রায় এগারোটা। ডাক্তার সেন মোটর থেকে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শোফায় ক্লান্তভাবে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর সাজগোজ ছাড়বেন। আজ কলের বেশি রকম হিড়িক গেছে।

এক মিনিটও গেল না, ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

মুখটা কুঁচকে উঠল। মেয়েকে ডাক দিতে যাচ্ছিলেন, এসে বলে দেবে ইনি এখনও বাড়ি ফেরেন নি, তারপর কি মনে হতে নিজেই আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

প্রশ্ন করলেন—"কে ?"

"বৌদি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন ! শীগ্‌গির আসুন—এক্ষুনি !"

নিরতিশয় উদ্বেগপূর্ণ উত্তরের খুব শান্ত অথচ বিরক্তিপূর্ণ প্রত্যুত্তর দিলেন ডাক্তার সেন—"কে তুমি আগে বলবে তো ? না, আমি মোটর নিয়ে বাড়ি বাড়ি জিগ্যেস করে বেড়াব কার বৌদিদি…"

"আপনি শীগ্‌গির আসুন"—অসহিষ্ণু বাধা পড়ল—"কোন মতেই অজ্ঞান ভাঙছে না বৌদির। আমি ? —আমি পরেশবাবুর ছোট ছেলে জীবন · শীগ্‌গির…"

"কি হয়েছিল বৌমার ?"—ডাক্তার এত অল্পে চঞ্চল হয় না, কণ্ঠস্বর অনেকটা নিরুদ্বিগ্নই রইল।

"খুন।"

"খুন !!…কে খুন করেছে !…কি দিয়ে ?…এক্ষুনি আসছি।"

রিসিভারটা রেখে দিতে যাচ্ছিলেন কট-কট্ করে সেই রকম উদ্বিগ্ন আওয়াজ হতে আবার তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি বলছিলে ?"

"খুন বৌদি না, দাদা। বৌদি আর মা এক সঙ্গে বসেছিলেন, দাদার বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে দেখে…"

"যতীন খুন হয়েছে!…কে করেছে?…ধরা পড়েছে, না পালিয়েছে?"

"পালায় নি। শীগ্গির আসুন আপনি!"

এবার ওদিকেই রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ।

ডাক্তার সেন হন্তদন্ত হয়েই নেমে যাচ্ছিলেন। পরেশবাবু ওঁর বান্যবন্ধু, অন্যদিন কল থেকে ফিরতে এ সময়টা ওঁর বাড়িতেই কাটে, আজ দেরি হয়ে পড়ায় আর যেতে পারেন নি।…নেমে খানিকটা এসেছেন, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে আবার উঠে গিয়ে ডায়ালটা ঘোরালেন পরেশবাবুর বাসার সঙ্গে সংযোগের জন্য। টের পাওয়া গেল ফোন্ খালি নেই।…কিছু আশ্চর্য হওয়ার নয়, যা কাণ্ডটা চলেছে।

রিসিভার রেখে ঘুরতে যাচ্ছিলেন, আবার তুলে নিয়ে পুলিশ স্টেশনের নম্বর তুললেন—

"আমি হচ্ছি ডাক্তার অজিত সেন। ডেপুটিসুপার মজুমদার আছেন অফিসে!"

"আমিই কথা কইছি। কি খবর? এ রাত্তিরে আমার খোঁজ?"

"খবর গুরুতর। ইয়ে…তুমি পরেশের ওখান থেকে কোন ফোন পেয়েছ কি?"

"না তো।"

"সে কি, পাওনি।· তাহলে নিশ্চয় তোমাদের কনেক্শন পায় নি। যাই হোক, বড় দুঃসংবাদ। তুমি এক্ষুন কিছু পুলিশ ওর ওখানে পাঠিয়ে দাও। আর কাউকে না পাঠিয়ে যদি নিজেই সঙ্গে নিয়ে যেতে পার তো সেই চেষ্টা কর।··ওর বড় ছেলেটি খুন হয়েছে! বৌটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে বলে এক্ষুনি আমায় ফোন করেছিল। একটু দেরি হয়ে গেল আমার।…খবর নিয়ে জানতে পারলাম আসামী পালাতে

পারে নি। কিন্তু ক'জন আছে, কি ব্যাপার কিছুই তো আন্দাজ করতে পারছি না। টাউন কি রকম ডিসটার্বড্ দেখতেই তো পাচ্ছ। যা হয় ঠিক করো ভাই। আমি চলি, অল্‌রেডি দেরি হয়ে গেছে বেশ।"

"এই রাস্তা দিয়েই তো যেতে হবে তোমায়। গলিটা মেরামত হচ্ছে। এসো, আমি তোয়ের হয়ে যাব ততক্ষণে। কী গেরো বলো দিকিন! নাঃ।"

মিনিট কুড়ি পরের কথা। ডাক্তার সেনের মোটর এসে পরেশবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়াল। পেছনে একটি পুলিস ট্রাক। জন দশেক সশস্ত্র পুলিস।

ডাক্তার সেন আর ডেপুটিসুপার মজুমদার বাড়িটার ওপর বিমূঢ়ভাবেই চোখ বোলাতে বোলাতে নেমেই দেখেন পরেশবাবু বেশ ধীরে সুস্থে উঠান পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন; দরজায় দাঁড়িয়ে নিতান্ত অবিচলিত কণ্ঠেই বললেন—"এসহে। ওরা কেন? ওদের ফিরে যেতে বলো।"

নিজেই পুলিসদের দিকে চেয়ে বললেন—"আপ লোক যা সকতে হেঁ।"

মজুমদারও ঘুরে বুড়া আঙুলের একটা ইশারা করে দিতে ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরেশবাবু বন্ধুদ্বয়কে বললেন—"চলো ওপরে, আমি জানতামই তোমাদের কপালে একটা নিগ্রহ আছে। ফোন ধরেছিল শুনেই তো সে হতভাগার গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা চড় বসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাতে তো তোমাদের ভোগান্তি…"

"আহা মারতে গেলে কেন? কিন্তু কথাটা কি—বাড়ি চুপচাপ, বৌমা আছেন কেমন?"—মজুমদার প্রশ্ন করলেন।

"চলো শুনবে সব। মেরেছি—মেরেছি, মেজাজের একেবারে ঠিক ছিল না ভাই। গিয়েছিলাম চন্দননগরে সান্থর বাড়ি। রাত্তিরে

ওখানেই থাকবার কথা। সকাল বেলায় একটা কাজের কথা মনে পড়ে যেতে চলে আসতে হোল। এসেই দেখি ঐ কাণ্ড। বৌমাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে পাখার নীচে শুইয়ে সবাই জটলা করছে—ব্যাপারটা বুঝতে যাব, আসার সঙ্গে সঙ্গেই একবার চোখ খুলতে গিয়ে 'রক্ত রক্ত' করে আবার অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সবাই একসঙ্গে গোলমাল করে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছে, ও হতভাগা ছুটে এসে —'আমি, অজিত কাকাকে ফোন করে দিয়েছি !"

ডাক্তার সেন বললেন—"তুমি ছিলে না, আমায় ফোন করেছে, সে তো ভালোই করেছে—কিন্তু কথাটা কি ?"

"কথাটা মূলে কিছুই নয়। সেই জন্যেই তো—এক ভাইয়ের ঐ কীর্তি, ইনি আবার তোমায় কি রিপোর্ট দিয়েছেন ভেবে আর রাগ সামলানো সম্ভব ছিল না। যাক, দাঁড়াও, তোমাদের একটু চা দিয়ে যাক।"

একটু বেরিয়ে চায়ের কথাটা বলে দিয়ে এসে আবার বসতে বসতে বললেন —"এমন গোলমাল করে দিয়েছে—কোন্ কথাটার যে কী ভাবে জবাব দেব যেন ঠিক করে উঠতে পারছি নে—হ্যাঁ, বৌমা বেশ ভালো আছেন। দোষ দেওয়াও তো যায় না, ওরকম একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য—ছেলেমানুষ—বিয়ের পর মাস ছয়েকও যায় নি—"

ওদের দু'জনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বললেন,—"থিয়েটার হে। আর দুঃখের কথা বলো কেন ? দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত খাবে ভীম।

…তা খাক, কিন্তু যতটা সয় তাই হিসেব করেই তো দেখানো উচিত ; তা নয়, রিয়েলিস্টিক করতে হবে। পোড়া বাস্তববাদের হিড়িক চলেছে তো। আমার কানে গিয়েছিল কথাটা, প্রেসিডেণ্ট থেকে শুরু করে ক্লাবের চাকরটা পর্যন্ত নাকি এই নিয়ে নুনআদা খেয়ে লেগেছে—শেষ পর্যন্ত একটা বুঝি চার পাঁচটা মুখ-ওলা পিচকিরি পেটেন্ট করা হয়েছে,—'রক্ত খাব—রক্ত খাব' বলে হুঙ্কার করে ভীম বুকে চাপ দিলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে স্টেজ ভাসিয়ে সবাইকে

তাক লাগিয়ে দেবে। দুঃশাসনের পার্ট নিয়েছেন আমার এই পাপ, থিয়েটার নিয়েই তো মেতে আছেন। আমি শুনেই বারণ করে দিয়েছিলাম, বৌমাকে যেন না নিয়ে যাওয়া হয়, ভেতো নাড়ি, অতটা রাজপুতী কাণ্ড বরদাস্ত হবে না! বৌমারও ঝোঁক ছিল না। কিন্তু আমি নেই দেখে ও হতভাগা কী লেকচার দিয়েছে ওই জানে, মোট কথা বৌকে বীরজায়া করে তুলে টেনে নিয়ে গেছে। কী অঘটন ঘটাচ্ছি আমরা, কী আর্ট জমাচ্ছি একবার দেখে জন্ম সার্থক করবে না?

তারপর আর্টের কেরামতি দেখতেই পাচ্ছ। শাশুড়ী বৌ আর মেয়ে পাশাপাশি বসে দেখছিলেন, ভীমসেনের হুঙ্কার আর দুঃশাসনের আর্তনাদের সঙ্গে যেই রিয়েলিস্টিক রক্ত পিচকিরি দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে এদিকে বীরজায়া ঢলে পড়লেন শাশুড়ীর কোলে। তারপরে সব জানাই। খেটে-খুটে এসে সমস্ত দিনের পর কোথায় একটু বিশ্রাম করবে, না, রাত দুপুরে এই হাঙ্গাম!"

ছোঁড়া চাকরটা ট্রে ক'রে চা দিয়ে গেল তিন জনের। দুঃখের হলেও হাসিই ঠেলে আসছে। মজুমদার পেয়ালা পিরিচ তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তারপর? যতীনের কি খবর; এসেছিল?"

"তুমি যে অবাক করলে হে! স্টেজ-ম্যানেজ করতে হবে—কখন কি সীন পড়বে, কি ফার্নিচার বসাতে হবে, যতীনদা; নাচে গানে বাঁশি বাজাতে হবে, যতীনদা; খুচরো পার্টের কোথায় কে আসে নি, তাতেও যতীনদা। তারপর এত সাকসেসফুল প্লে!—একটা ভদ্দর লোকের মেয়েকে ঘরে এনেছি, সাক্‌সেসফুল প্লের ফলে সে শেষ হয়ে গেল কি রইল—এ তুচ্ছ কথা ভাববার ফুরসত—"

"কৈ রে হীরু—তোর বৌদি নাকি রক্তপানের সীন দেখে ভির্মি গেছে?"

যতীনেরই গলা, দরজা থেকেই কথাটা বেশ হাল্‌কাভাবে বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। পরেশবাবু সমস্ত রাগ নিয়ে বোধ হয় ভীমের চেয়ে বড় হুঙ্কার দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, ডাক্তার সেন

হাতটা চেপে ধরে বসিয়ে রাখলেন, চাপা গলায় বললেন—"সবটা শুনে নাও না। ট্রাজেডী যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে ; এখন কমেডীটা নষ্ট কর কেন ?"

বাড়িটা একেবারে থমথমে। কারুর আওয়াজ না পেয়ে এগিয়ে আসছে—নিজের খেয়ালেই আওড়াতে আওড়াতে—

"একবার দেখুক উঠে সেই চেরা বুকের মাঝখানে এখন···"

একটা মেডেল পেয়েছে, চেতানো বুকে সেটা লটকে আসতে আসতে পরেশনাথের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ওঁরা তিনজনেও রইলেন চেয়ে। রাগ চেপে রাখবার জন্য মজুমদার পরেশনাথের হাতটা আছেন চেপে।

একেবারে চাপতে পারলেন না কিন্তু পরেশনাথ।

দাঁতে পিষে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন—"বেঁচে এলি ?"

কোন উত্তর নেই, মুখের ভাবেও কোন পরিবর্তন নেই। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু আর একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হোল—

"কিন্তু জিগ্যেস করি, এমন বেঁচে থাকায় ফল ?"

"ফ্রুড্ পাজ্‌লিং"

একই নিয়মে বলা যায়—গেঁয়ো যুগী যেমন ভিক্ পায় না, কাছের তীর্থেরও তেমনি আদর নেই মানুষের কাছে। কপিলেশ্বরস্থানের কথা বলছি। জায়গাটি এককালে কপিল মুনির আশ্রম ছিল বলে পরিচিত এখানে। আমাদের শহর থেকে পনর-ষোল মাইল, বড় রাস্তার ওপরে, পিচ-ঢালা হয়ে রাস্তা আরও সুগম, তবু এখানকার এই ষাট বৎসরের বাসে মাত্র একবার গেছি। তাও কপিলেশ্বরস্থান উদ্দেশ করেই নয়। পথে যেতে যেতে নেমে একবার ঠাকুরের সামনে মাথা ঠুকে আসা। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, আমাদের তখন ফুটবলের যুগ চলছে। নির্ভেজাল ভক্তির যুগ। দেবতা বাছি না, পীর বাছি না, দেখলেই মাথা নোয়াচ্ছি, একমাত্র প্রার্থনা—"ঠাকুর, গোল করিয়ে দাও।"

ফুটবলের দল নিয়েই যাচ্ছিলামও সেবার। মনে আছে আবদুল গনি বলে দিয়েছিল, "ভাই হামারে বাস্তে ভি দোবের কপাড় ঠোক লেনা।" অর্থাৎ তার হয়েও যেন বার দুই কপাল ঠুকে নিই। ওরাও সমস্যার গুরুত্ব বুঝে দেবতা-পীর বাছত না।

আজ আবার এতদিন পরে কপিলেশ্বরস্থান টানল কেন বুঝতে পারলাম না। হয় তো এও সেই রকম ফাঁকির ভক্তি; ভয়ের ভক্তিই বলা যাক! কোন তীর্থই সারা হোল না তো জীবনে, এদিকে জবাবদিহির দিন দ্রুত এগিয়ে আসছে, অন্তত হাতের কাছেরটা সেরে নিয়ে দোষ খণ্ডন করে রাখা যাক।

সঙ্গে নিলাম বাড়ির এক রকম সবাইকেই, নাতনী সুতপাটিকে পর্যন্ত। বছর খানেকের মানুষ, কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে তীর্থ করবার মতো না হলেও মনের দিক দিয়ে এ রকম পাকা বুড়ী হয়ে গেছে এরই মধ্যে যে নেহাত বে-মানান হবে না। তা ভিন্ন আধুনিকা মেয়ে,

এর পর ঠাকুর-দেবতাদের আমল দেবে কি না কে জানে, ভাবলাম একেবারেই যে বাদ দেয় নি তার একটা দলিল তোয়ের করে রাখা ভালো।

ঘণ্টাখানেকের পথও নয়; বিকাল হয়ে এলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শীতকাল, সন্ধ্যা হতে হতে ফিরে আসতে পারলেই ভালো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখো হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের মোটরটা শহরের প্রত্যন্ত ভাগে এসে পড়ল এবং তার পর একটু পূর্বমুখো হয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। এদিকটা আমাদের শহরের খিড়কির দিক। মিথিলার সবচেয়ে বড় শহর আমাদের এটা, রাজধানীই বলা চলে, কিন্তু মিথিলার ছাপ পাওয়া যাবে না এখানে—এই জগাখিচুড়ির যুগে কোন্ রাজধানীতেই বা সে দেশের ছাপ আছে? কলকাতায় বাংলার ছাপ আছে? বোম্বাইয়ে মারাঠার ছাপ আছে? আসল কথা, সব শহরেরই কেন্দ্র থেকে নিয়ে সদরের দিকটা আগাগোড়াই বহির্বিশ্বের সঙ্গে ওতপ্রোত। দেশকে খুঁজতে হলে তার খিড়কির দিকেই খুঁজতে হয়।

শহরে থেকে থেকে যেন দেখাই হয়নি এত দিন এই মিথিলা দেশটাকে। কিংবা বাল্য আর প্রথম-যৌবনের মুক্ত জীবনে কবে হয়েছিল একবার দেখা—পরে অশেষবিধ দেখার মধ্যে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে

আবার আজ নূতন করে দেখতে দেখতে চলেছি।

মাঠের পর মাঠ একেবারে সেই দিগন্ত পর্যন্ত পড়েছে লুটিয়ে। শীতের ফসলে ঢাকা—গাঢ় নীল খেঁসারি, কলাইয়ের চাষ, তিসির নীল ফুলের বিন্দুগুলা বাতাসে দোল খাচ্ছে—তার পাশেই একখানা হলুদ চাদর এমুড়ো-ওমুড়ো রোদে বিছানো; সর্ষের ফুল ধরেছে। গমের-যবের মাঠেও সোনালী রং ধরতে আরম্ভ হয়েছে। একটার গায়ে একটা এই পাঁচরঙা ফসলের মাঠ একেবারে দূর-দিগন্তে গেছে

মিশে। আজ আকাশ পরিষ্কার; উত্তরে আমাদের বাঁয়ে দিক-রেখার খানিকটা ওপরে পূব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আকাশের গায়ে একটা উঁচু-নিচু রূপালী রেখা—হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গমালা—এখান থেকে প্রায় শ'দেড়েক মাইল তো বটেই। রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে-ওখানে সোনালী ছোপ ধরছে।

রাস্তার দু'ধারে, দূরে কাছে গ্রাম। বড় বড় আম-বাগানে একটা থেকে একটাকে করেছে আলাদা। আম-বাগান না হোল তো মাঠই। না হয় কমলা নদীর কোনও সুঁতি। অনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করে কমলা-মাঈ, পশ্চিম-মিথিলার সমস্তটায় তারা আছে ছড়িয়ে। পূবে আছে কুশী তার বৃহত্তর পরিবারবর্গ নিয়ে।

ঢালু পথ, কত দূর থেকে এসে ঐ হিমালয়ের কোল লক্ষ্য করে চলেছে। শীতের পথ, বেশ লোক চলাচল। এক এক জায়গায় একটু ভিড়ের মতোই। বোধ হয় হাট বসবে কোথাও। চলেছে সবাই; খদ্দের, তার সঙ্গে বেচনদারও। কারুর ঝুড়িতে চারটে লাউ, কারুর মাথায় চালের থলে, হয় তো বা চিঁড়েরই। মিথিলা হচ্ছে ফলারের দেশ। আমাদের মোটর হর্ণ দিতে দিতে চলেছে।

পুকুরঘাটে গ্রাম্য মুখিয়াদের 'চণ্ডীমণ্ডপ' বসেছে। উপুড় হয়ে ব'সে গামছা দিয়ে হাঁটু দুটা জড়ানো। খৈনি চলছে। একটা "ঠাহাক্কা" উঠল সমবেত কণ্ঠে। "ঠাহাক্কা" হচ্ছে এদের প্রাণখোলা হাসি; একেবারে আকাশ লক্ষ্য করে ছোটে।

একটি পাকুড় গাছের ছায়ায় একটি মাঝারি গোছের "বরিয়াৎ" আড্ডা জমিয়েছে। বরিয়াৎ অর্থাৎ বরযাত্রী। ফিরতি বরিয়াৎ। রাঙা মোজা, হল্‌দে কাপড়, রাঙা উড়ানি, মাথায় রাঙা পাগ বর রয়েছে এক ধারে বসে। রং-করা বড় বড় চ্যাঙারিতে উপঢৌকন। বড় বড় মাটির গামলা আর আলপনা-আঁকা হাঁড়িতে দই। যাত্রীরা আসে-পাশে ছড়িয়ে রয়েছে; কেউ বসে, কেউ হেলান দিয়ে। একটু তফাতে শালু-ঢাকা

পাল্‌কির ভিতর থেকে ক'নে-বৌয়ের স্তিমিত কান্নার স্বর আসছে ভেসে।

সুপার মা দেশের মেয়ে, খাস হাওড়া-শহরের, অবাক হয়ে গেছেন। সুপাকে ধরে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠেছে গাড়ির মধ্যে। এত বিচিত্র সঙ্গী, নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার এমন খোলা জায়গা অত—মোটর গাড়ি বন্দীশালা হয়ে উঠেছে তার পক্ষে।

সুপার মার কথা ফুটল ত একেবারে যেন কোন্ সেই আদি যুগে চলে গিয়ে।

"হ্যাঁ মেজোকাকা, একটা কথা জিগ্যেস করি?"

"কি কথা মা?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"রামচন্দ্র সীতাকে বিয়ে করে এই পথেই তো নিয়ে গিয়েছিলেন?"

"আর কোন্ পথে যাবেন মা? তবে আমাদের সময়ের মতন নিশ্চয় এমন পিচ-ঢালা ছিল না পথ।"

গাড়ির মধ্যে নানা কথা নিয়ে যে আলোচনা চলছিলো মেয়েদের মধ্যে, তা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বুঝছি সুপার মার কথার সূত্র ধরে সবার মনই চলে গেছে সেই যুগে। হস্তী-অশ্ব-পদাতিক নিয়ে ঋষি-মুনি রাজন্য আর সামান্যজনের সে কী বিরাট মিছিল! বীর-বীরোত্তমদের মাথা হেঁট করিয়ে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করলেন। মহামহিমান্বিত অযোধ্যাপতি রাজর্ষি জনকের অলোকসামান্যা দুহিতাকে পুত্রবধূ করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পথই তো! সে আনন্দ-মিছিলের নৃত্যগীতের গুঞ্জন, তূর্য-ভেরীর নিনাদ যুগের অলিন্দ বেয়ে আজও আসছে ভেসে, এই পথের যাত্রী একটু কান পাতলেই শুনতে পাবে বৈকি!

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা স্তব্ধতা ছেয়ে রইল গাড়ির ভেতর, শুধু মসৃণ পথে মোটরের একটা শির্‌শির্ শব্দ।

কথা যোগালে বধূমাতা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারেন না। সেই সমারোহের স্মৃতি থেকেই যেন বেরিয়ে এসে বললেন—"আপনি যেমন

বলছেন এমন চমৎকার পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল না মেজোকাকা, তেমনি আমিও একটা কথা বলব ?"

উত্তর করলাম, "বলো না মা !"

"সোনার-রাস্তা হয়ে গিয়েছিল। রাম-সীতা যাচ্ছেন, সোজা কথা।"

হেরে গিয়ে ওঁকেই করলাম সমর্থন—"তা যেমন বলেছ। পায়ের আঙুল ঠেকে পাথর মানুষ হয়ে গেল, মাটি সোনা হয়ে উঠবে এ আর বেশি কথা কি !"

এর পরে যে স্তব্ধতাটুকু এসে পড়ল তা আমাদের একেবারে কপিলেশ্বরস্থানের আনাচেয় পৌঁছে দিল।

পুরাদস্তুর তীর্থ কপিলেশ্বরস্থান, গাড়ি থেকে নামতে না-নামতে পাণ্ডার দল ঘিরে নিল আমাদের। কিছু জানবার-বোঝবার আগে একজন দখল করেও নিল। "ঘ···ঝা।"

"আমি আছি অমুক ঝা বাঙালীবাবু। বাবার পাণ্ডা। খুব ভালো করে বাবার দর্শন করিয়ে দেবো মাঈজীদের; পুরনো, বনেদী পাণ্ডার ঘর আমাদের, সেই কপিলমুনির সময় থেকে এই কাজ করিয়ে আসছি হাম সব। কিছু দিতে ইচ্ছে হোয় দিবেন, না ইচ্ছে হোয় দরকার না আছে। পুরুষানুক্রমে এই কাজ হাম সোবাদের—ভক্তের সেবা—ভক্ত আবার ভগবানের চেয়ে বড় কিনা, গোস্বামী তুলসীদাসজী বলিয়েছেন···"

কি বলেছেন জানা না থাকার জন্যই হোক, অথবা দখল করবার একটা চমৎকার আইডিয়া হঠাৎ মাথায় এসে যাওয়ার জন্যই হোক, "ঘ···ঝা" মাঝখানেই কথাটা থামিয়ে দিয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এসো খোঁখী।···আহা কী রূপ আঁছে! যেনো সাক্ষাৎ পার্বতী মাঈ !"

বন্দীদশা থেকে মুক্ত সুপাও আমার কোল থেকে পড়ল ঝাঁপিয়ে। "ঘ···ঝা"র কাছে বন্দী হলাম।

একেবারে রাস্তার ধারেই দুটি মন্দির, মুখোমুখি হয়ে। মাঝখানে একটা বাঁধানো চত্বর। পাশেই একটা ছোটখাট বাজার; গোটা তিন-চার দোকানে চিড়া-মুড়ি, বাতাসা, পানতুয়া-জিলাপি-পাঁ্যাড়া—কতকালের বলা শক্ত—এক মেলা থেকে অন্য মেলা পর্যন্ত আয়ু তো—কতর আয়ু নষ্ট করবে এর মধ্যে, ভূত-প্রেতের পাল বাড়াবে বাবা কপিলেশ্বরের…

"হাত-পা ধুয়ে নিবেন চলুন আগে—মাঈজীরা আসুন।"

গাড়ির জড়তা ঝেড়ে ফেলে পুকুরের দিকে এগুলাম আমরা। প্রশস্ত পুকুর। অনেক আগে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অবস্থাটা এখন যেন অনেক ভালো বলে মনে হোলো। সমস্ত পুকুরটা ঝালিয়ে, পাড় ঠিক করে দিয়ে চমৎকার একটি ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন দ্বারভাঙ্গার মহারানী। তরতরে জল, আকাশের নীলিমা বুকে করে আছে পড়ে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় শীতের কুঞ্চনের মতো একটা বিচিভঙ্গ উঠেছে।

সবাই নেমে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিলাম। মাথায় জল ছিটিয়ে মনে হোলো একটা যেন হোলো পরিবর্তন। বলে তীর্থ-পুষ্করিণীতে গঙ্গা অধিষ্ঠান করেন। অন্তত এখানে তো করতেই হবে, শিব-তীর্থই তো।

যতটা পারছি পেছনের জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি মন্দিরের দিকে, কিন্তু হায়! মাটির মলা এড়ানো কি এতই সহজ?

সেই কথাই ভাবছিলাম খানিক পরে ঘাটের একটা পৈঠায় বসে।

দেবদর্শন হয়ে গেছে আমাদের। বেশ হচ্ছিল—আপনভোলা ভোলানাথের মন্দিরে গিয়ে যেমন বরাবর হয়ে এসেছে, সঙ্কোচ নেই, অন্য সব দেবমন্দিরের মতো পদে পদে অপরাধের শঙ্কা নেই। জল ঢেলে, দুটো বিল্বপত্র আর দু'খানা বাতাসা ফেলে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, এই তো পূজা। বেশ মনে হয় না যে নিতান্ত

আপনজনের কাছে এসে পড়েছি? সুপার মাথাটা জোর করে ঝুকিয়ে বেদিতে ঠেকিয়ে দিতে মাথা তুলে "উঃ!" করে একটা ধমকই দিল ঠাকুরের দিকে চেয়ে—যেমন আর সবাইকেই দিচ্ছে কথায় কথায় আজকাল, বুড়োয়-শিশুতে কি বোঝা-পড়া হোলো? "ঘ·· ঝা"র মতে যদি পার্বতী মাঈ-ই তো কলহের পূর্বাভাস নাকি কর্তা-গিন্নিতে? একটা অপরূপ তৃপ্তিতে ভরে এসেছে মনটা, ঠিক এই সময় আঘাতটা এসে পড়ল।

"ঘ · ঝা" বেদীর ওপর থেকে বিল্বপত্র, আলোচাল, বাতাসা সরিয়ে পয়সা-রেজগিগুলা তুলে তুলে নিচ্ছিল, আমি হাত পেতে বললাম—"একটু প্রসাদ বাবার।"

"শিবের প্রসাদ তো খেতে নেই!" বেশ বিস্মিত হয়েই "ঘ · ঝা" চাইল আমার পানে। বিস্ময়ে চোখ ফেরাতে পারছে না, এত বয়সেও এই সামান্য কথাটা জানি না আমি! আরও সবাইয়েরও যেন তাক্ লেগে গেছে, অনেকে তো জড়ো হয়েছে মন্দিরে, শহর থেকে বাঙালীবাবু এক এসেছে সপরিবারে, মোটরে করে।

আমার বিস্ময় ওর চেয়ে কম নয়। ধাক্কাটাও তাই তেমনি রূঢ়। শিবঠাকুরের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান এক ছিল সেই পরীক্ষা দেওয়া আর ফুটবল-খেলার যুগে। বাল্য-যৌবনের কথা। মাথায় হাত বুলিয়ে মাথা ঠুকে চাল-কলা-বাতাসা, যা পেয়েছি, তুলে নিয়ে গালে ফেলে দিয়েছি। পাশ করেছি, গোলও করেছি। তার পর আর সবার কাছে যখন জীবনের তত্ত্ব অন্বেষণের যুগ, আখেরের জন্য সঞ্চয় করছে, তখন আর দেখা সাক্ষাৎ কোথায়?

আঘাতের প্রতিক্রিয়াতে কিন্তু দেরি হোলো না আমার। "ঘ···ঝা" বাইরের ছেলেমেয়েগুলাকে দেওয়ার জন্য এক মুঠা বাতাসা তুলে নিয়েছিল, বললাম—"না, দাও, আমায় খেতে আছে।"

খান দুই তুলে নিয়ে উঠে পড়লাম। একটা নিজের মুখে ফেলে দিলাম, চূর্ণ করে একটু সুপার মুখে।

এদিককার মন্দিরে পার্বতীর মূর্তি। প্রসাদময়ী রাজরাজেশ্বরী।

ঘাটের রাণায় এসে বসলাম। ওপরে, অনেকখানি তফাতে মেয়েরা স্টোভ জ্বেলে ঘিরে বসেছে ; চা, সুপার দুধ।

বড় আঘাত পেয়েছি। হিন্দুধর্মের জটিলতা, যতই পাক খুলতে যাচ্ছি, যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে আরও। এ কি করে সম্ভব ? কবে কোথায় যেন পড়েছিলাম, শিব হচ্ছেন অনার্যের দেবতা, সেই জন্যই কি ব্রহ্মণ্য আর্যের এই ঔদ্ধত্য ? অথচ বরদানে খোলা-হাত বলে বেশ স্বীকার করে নিল তো দেবাদিদেব বলেই। আর তা কি সত্যই নয় ?

আকাশ মলিন হয়ে আসছে, যেন আমার মনের প্রতিচ্ছায়া নিয়েই। সব কেমন যেন বিস্বাদ বলে মনে হচ্ছে ; কিছু নয়, অথচ যেন সহ্য হয় না।

একটু আলো দাও আমায়··

"বাবুজী !"

একটু চকিত হয়েই ঘুরে দেখি "ঘ · ঝা" পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, "কি ?"

একটু তফাৎ হয়ে পাশে বসল।

"আপনি তোখন, বাবার পরসাদ অমন করে ছিনিয়ে নিলেন···"

বিমূঢ়তার মধ্যে ওর ওপরই বিরক্তিটা এসে পড়ল আর কিছু হাতের কাছে না পেয়ে। ঘুরে বসে বললাম—"ঠিক কথা পাণ্ডাজী, আপনারা তো বংশানুক্রমে বাবার সেবায় লেগে রয়েছেন, সব দেবতার ওপরে তিনি—দেখতেও পাওয়া যায় তাই—সবারই কোন-না-কোন গলদ আছে, ইনি তো একেবারে নিদাগ, তবু তাঁর প্রসাদ খাওয়া হবে না কেন বুঝিয়ে দিতে পারেন আমায় ?"

একটু হকচকিয়ে গেছে। আমতা-আমতা করে উত্তর করল,— "উঠো ঠিক না আছে বাবুজী।"

"কিন্তু কেন ঠিক নয়?—সেই কথাই জানতে চাই আমি।"

"এথি···শাস্ত্রের মানা আছে।"

"কিন্তু মানাটা কেন? একটা হেতু থাকবে তো? এক্ষেত্রে তা তো নেই ই, আরও যেন উল্টো কাণ্ড।"

মাথা চুলকাতে লাগল হেঁট হয়ে 'ঘ···ঝা"। বার দুই কুণ্ঠিত ভাবে আড়চোখে চাইলও আমার মুখের দিকে, আমার চেয়ে ওর সমস্যাটা কম নয়; দক্ষিণাটা পায়নি এখনও।

এক সময় মুখটা ওর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন হঠাৎ মস্ত বড় একটা সমাধান পেয়ে গেছে। মাথা তুলে বেশ সপ্রতিভ হাসি নিয়ে বলল—"আছে কারণভি বাঙ্গালীবাবুজী—আছে, আপনি নাহক গোস্‌সা করছেন···"

"কারণটা তাহলে?···" প্রশ্ন করলাম আমি।

"ফুড্‌পাজ্‌নিং বাঙ্গালীবাবুজী।"

"সেটা আবার কি জিনিস?"

"এটা অঘন্‌ মাস আছে। গেলো শাওন মাসে আমাদের গ্রামে ফুদ্দি ঝার বালকের উপনয়ন ছিল। সব গোঁয়াদের ভোজ দিলে, যেতো বরাহমন ছিল। ঘরে এসে সোবার পেটে দরদ, তার থেকে সে এক রকম কলেরাই বোলা যায়। একলা হীরাবাবু ডাগদর কি করবে? পাশের গাঁও থেকে দু'জন অওর ডাগদর এসে কোন প্রকারসে সামলে নিল। পরদিন হল্লা—খোঁজ্‌, খোঁজ্‌ কি বাত আছে। দেখা গেলো তামার বর্তনে খট্টা (অম্বল) ছিল, একেবারে···"

"বুঝেছি—ফুড পয়েজনিং (Food Poisoning)। কিন্তু শিবের প্রসাদ তো একটু চাল, কলা বা বাতাসা, তাও পরিষ্কার পাথরের ওপর নিত্যি জলঢালা হচ্ছে—বিল্বপত্রের কাছেও শুনেছি রোগের বীজাণু ঘেঁষতে পায় না···"

"অ-হ-হ, আপনি সোমঝালেন না। মহাদেবজী তো গাঁজা-ভাং ধুতুরা নিয়ে আছেন। একবার ভাবিয়া দেখুন বাবুজী—পরসাদ তো

তাঁর মুখের উচ্ছিষ্টই আছে—ফুড্ পাজ্‌নিং হোবে কি হোবে না?…
আপনার হাঁসৃসি আসছে বাবু, লেকিন খেয়াল করুন—বাজারের ভেজাল
মাল নোয়, খাস হিমালোয়ের এক নম্বর গাঁজা-ভাং-ধুতুরা—রত্তিভর
পরসাদিতে লাগিয়ে গেলে ভক্তদের কি হালত হোবে—তামার বর্তনে
যে-লোকদের একটু খট্টা বরদাস্ত হোয় না…"।

বিজ্ঞের মতো চেয়ে রইল মুখের দিকে চোখ ছুটো বড় বড় করে।
একটু হাসিও ফুটি ফুটি করছে; মস্ত বড় এক শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধানে
হ'য়ে গেল তো।

শিকারী

রবিবারের সকাল। সদাশিব দাবা খেলতে এসেছিলেন, মহিম চাটুজ্জ্যে বাড়ি নেই শুনে চলে যাচ্ছিলেন, ছেলেরা বাইরের রক থেকে উঠে এসে ঘেরেঘুরে বসল। গজানন বলল—"গল্প বলুন দাদু,অনেকদিন পরে একা পাওয়া গেছে।"

নুটু বলল—"আচ্ছা দাদু, আপনার গল্প শুনলে তো মনে হয়, হেন কাজ নেই যা করেন নি জীবনে—বাঘ মেরেছেন কখনও ?"

নুটুর রোগ, চটিয়ে দেয় মাঝে মাঝে। সদাশিব একটু আড়ে চেয়ে বললেন—"গল্পও শুনতে হবে, আবার ভাঁওতা দিচ্ছি বলে ঠাট্টাও করতে হবে ? এমন গল্প নাইবা শুনলি, আমিও নাইবা বললাম···"

সবাই আবার চেপে ধরল, নুটুর কথা বাদ দেওয়ারই মতন—ওটা আবার মানুষ—না বিশ্বাস হয়, উঠে গেলেই পারে, কেউ তো মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রাখছে না···

গজানন বলল—"তাই যা নুটু। আর শুনবি তো দাদুর আজকের বিড়ির খরচটা তোর, যা নিয়ে আয়গে। একটা দেশলাইও।"

নুটু উঠে গিয়ে রকের পাশেই জংলির দোকান থেকে এক প্যাকেট বিড়ি আর একটা দেশলাই নিয়ে এল। প্যাকেট ছিঁড়ে একটা ওঁর হাতে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে এগিয়ে ধরে বলল—"নিন দাদু, আপনি ক'ষে দম দিয়ে যেরকম খুশি বলুন, দেখি আমার চেয়ে কে বেশি বিশ্বাস করতে পারে।"

সদাশিব মুখের ধুঁয়াটুকু ছেড়ে একটু হেসে বললেন—"ভাঙবে তবু মচকাবে না।" তারপর আরও গোটাকতক টান দিয়ে, ছাইটা আঙ্গুলের টোকায় ঝেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন—"ভাঁওতার কথায় মনে পড়ে গেল। বাঘ মারিনি বটে, তবে ভাঁওতা দিয়ে তাড়িয়েছি একবার।"

"আমার বড় জামাই হীরেন বেহার সরকারে জঙ্গল বিভাগে কাজ পেয়ে হাজারীবাগ জেলায় পোস্টেড্ হয়েছে. মেয়ে অনেকদিন থেকে যেতে বলেছিল, তারপর পূজোর ছুটিতে কয়েকদিনের জন্যে এসে টেনেই নিয়ে গেল আমায়। জায়গাটা হাজারীবাগ শহর থেকে মাইল ত্রিশেক উত্তরে। ওদের আফিসকে মাঝখানে ক'রে ছোট খাটো দিব্যি একটা কলোনি। বাঙ্গালী পরিবার দুটি—আমরা আর হীরেনের অফিসার মিস্টার গড়গড়ির পরিবার। তবে আমি যখন গেলাম তখন লোক হয়েছি আমরা অনেকগুলি। আমার সঙ্গে তোমাদের ঠানদিদি গেছে, পরেশ, নিতাই, তুকু, মিলি গেছে, বাচ্ছা নাতি-নাতনী দুটিকে নিয়ে আমরা দশজন। মিস্টার গড়গড়ি বিলাত-ফেরত। বড় ছেলে সুনন্দ ইন্‌জিনিয়ার, একটা বড় ট্রেনিং নিতে বিলাত যাওয়ার কথা হচ্ছে, জামাই অমরেশ নতুন ব্যারিস্টার; কিন্তু একেবারেই কোন চাল নেই কারুর, কাজেই মেলামেশা করতে কোনও রকমই অসুবিধা বা সঙ্কোচের কিছু রইল না। আমায় তো জানিসই, মিস্টার গড়গড়ির দুই ছেলে, একজামাই, চার মেয়ে, এক পুত্রবধূ—সবার দাদু হোয়ে জমিয়ে বসলাম—খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, গল্প, সাইট্-সিইং (Sight-seeing), পিক্‌নিক্—যেন হাল্কা হাওয়ায় উড়ে যেতে লাগল দিনগুলো।

কয়েকদিন পরে বড় ছেলের আফিস খোলায় সে চলে গেল। পুত্রবধূ রয়ে গেল, তবে ছোটছেলে আর সেজো মেয়েটি এল দাদার সঙ্গে চলে, তাদের কলেজ খুলেছে। এরা তিনজনই ছিল সবচেয়ে বেশি হুজুগে, বেশ মন্দা পড়ে গেল আমাদের হুল্লোড়বাজিতে। ঘোরাফেরা একরকম শেষই হোয়ে গেল—প্রায় সব জায়গাগুলো তো ঘোরাও হোয়ে গেছে, তার সঙ্গে পিকনিকও হোল বন্ধ; গল্প-গুজব আর কিছু-কিছু খাওয়া-দাওয়া, এই নিয়ে কাটাতে লাগলাম আমরা। ওরকম চড়া পর্দার পর একেবারে খাদে নেমে আসা,—বেশ একটু একঘেয়ে হয়ে উঠল।

একদিন গল্পগুজবই চলছে, তার সঙ্গে একঘেয়েমিটা কি ক'রে আবার ভাঙা যায় সেই নিয়ে জল্পনাকল্পনাও, মিস্টার গড়গড়ির পুত্রবধূ ছন্দা বলল—"দাদু, এতগুলি বঙ্গবীর একত্র হোয়েছিলেন, একদিনও তো শিকারের নাম করতে শুনলাম না। এখনও যাননা, তাতেও তো⋯"

বললাম, "ভদ্রে, এত দেরি করে বলতে হয়? বীর বলতে আসল বীর ছিলেন তোমার স্বামী-দেবতাটি, তোমায় স্বর্ণ-মৃগ এনে দেওয়ার অধিকারীও। তাঁকে বুদ্ধি ক'রে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে এই দুটি অক্ষমকে লজ্জা না দিলেই হোত না?"

উত্তর হোল—"দেবতাকে স্বর্ণমৃগের খোঁজেই তো পাঠিয়েছি, দাদু, —জানেনই তো আমাদের গয়নার সাধ কখনও মেটে না। আপনারা ধ'রে আনবেন দুটো সাধারণ মৃগ, যাতে মাত্র কালিয়া-কোর্মার সাধ মেটে। যাননা একট। বীর আপনারাই বা কম কিসে?"

বললাম—"কম নয়, তবে তুমি শ্রেণীবিভাগে একটু ভুল করেছ। আমরা দুটিতে হচ্ছি বাক্যবীর; আমি গল্পদিয়ে তোমাদের সবাইকে জয় করেছি, অমরেশ তর্ক দিয়ে মক্কেল জয় করে।"

হুজুগটা কিন্তু চারিয়েই পড়ল। মিস্টার গড়গড়ির তিনটি মেয়েও রয়েছে। মেজো মেয়ে অতসী বলল—"আমি কিন্তু বলব, আপনি তা'হলে এখন আসলে বাক্য দিয়ে বীরত্ব চাপা দিচ্ছেন দাদু। আপনি নিশ্চয় শিকার করতে জানেন, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। আর অমরেশ'দার সম্বন্ধে তো কোনও সন্দেহই নেই—কত গল্প যে শুনেছি ওঁর কাছে। না, একবার হোয়ে আসুন; এবার তো ফিরবও।"

বললাম—"বেশ যাব, কপালে যদি তাই লেখা থাকে, খণ্ডাবে কে?"

ছন্দা জিজ্ঞেস করল—"ও-কথা বললেন যে?"

বললাম—"কালিয়া-কোর্মার সাধ নিয়ে তো সেখানেও নোলার জল ফেলছে ভাই, দুর্লভ নরমাংসের কালিয়া-কোর্মা!"

অতসীর ছোট সুজাতা বলল—"বাঘ-ভাল্লুকের কথা বলছেন দাদু? না, সে এ জঙ্গলে নেই।"

ও স্বাস্থ্য সারাতে কয়েক মাস এখানেই রয়েছে, বলল—"এই তো দু'বার পাটনা থেকে এসেছিল সব ; শুধু দুটো ক'রে হরিণ, একবার একটা খরগোস তার সঙ্গে।"

অমরেশকে বললাম—"কি হে ভায়া আর তো লজ্জা রাখা যায় না। তোমারই ভরসা, অথচ তুমি তো একটিও কথাই কইছ না।"

অমরেশ চুপ কোরে বসেছিল জানালার দিকে মুখ ক'রে একটু অন্যমনস্ক হয়ে। ঘুরে একটু গম্ভীর হয়ে বলল—"বাঘ-ভাল্লুকই নেই যখন···আমি হরিণ খরগোশ মারবার জন্যে যেতে পারব না। মশা মেরে হাতে ময়লা করা !"

ওদের বড় বোন সুচিত্রা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, বলল—"তা'হলে না হয় থাক্।"

গজানন প্রশ্ন করল—"খুব বড় শিকারী বুঝি দাদু? ব্যারিস্টাররা প্রায়ই হয়।"

বিড়িটা শেষ হোয়ে এসেছে। একটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে সদাশিব বললেন—"লেম্যানের কথা তো শুনলিই। তুই আমি পারি? আর সত্যি, হরিন খরগোশ মেরে তো শিকারীর নাম কেনা যায় না।···ঘুটুর রগে একটা টোকা মারলেই রক টপকে রাস্তায় ছিটকে পড়বে, তা'থেকে তো প্রমাণ হয় না যে আমি একজন বক্সার মস্তবড়।"

কিন্তু রাজী হোতে হোল অমরেশকে। ওরা দুই বোন আর ভাজে ধমকে উঠল সুচিত্রাকে। চন্দা বলল—'অমনি কর্তার কথায় গিন্নি সায় দিয়ে উঠলেন!'

অসীও বলল—'তুমি থামো তো বড়দি। হুকুম হোল, তা'হলে থাক্!'

সুজাতা বলল—"এমন একজন ভালো শিকারী, অথচ এত আগলে আছ, আজ পর্যন্ত একবার দেখতে পেলাম না হাতের কাজ। আজকালকার স্ত্রী, কোথায় আরও বন্দুক হাতে এগিয়ে দেবে······"

একবার যখন রাজী হোল, আবার নিজমূর্তিতে ফিরে এল অমরেশ।

তোদের আগে একবার যেন বললাম—এদের কারুর চাল বা বাজে স্টাইল ছিল না। একটু ভুল বলেছি। অমরেশের ছিল। তবে বড়-মানুষী নয়, একটু লম্বা চওড়া গলা হাঁকতে ভালবাসত। তবে (হুটুর দিকে আড়ে চেয়ে)—আমার মতন তো ভাঁওতা নয়, পেটে বিদ্যে আছে গায়ে শক্তি আছে, বিলাত-ফেরত ছেলে, অনেক দেখেছে শুনেছে, অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। একবার রাজী হওয়ার পর সেই ভাবটা আবার ফিরে এল। তোড়জোড় করতে দুটোদিন যে লাগল তাতে শিকারেরই গল্প চলল আমাদের।······অমরেশ বলল ও নাকি এসেই ভেতরে-ভেতরে খোঁজ নিয়ে টের পেয়েছিল—বাঘ ভাল্লুক-গণ্ডার-হাতি কিছুই নেই এসব জঙ্গলে, এমন কি বুনো শূওরও নয়। তাই, পাছে নিরীহ হরিণ-খরগোশ-গিনিপিগ্ মারতে ঠেলে দেয় সবাই জোর ক'রে তাই শিকারের কথা একেবারেই তোলে নি।—নৈলে শিকার ওর রক্তে আছে। বাবা ছিলেন মস্ত-বড় শিকারী, করবেট সাহেবের সঙ্গে কতবার কুমায়ুন পাহাড়ের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন, আত্মপ্রকাশ চাইতেন না—অমরেশদের বংশের ধারাই নয় ওটা, তবে করবেটের Man eaters of Kumayun বইটা একটু তলিয়ে পড়লেই তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। এই রকম আরও সব গল্প। আমি ভাই লুকুবো না তোদের কাছে, খানিকটা সাহস পেলাম, আর তাই জোর করে আমিও লম্বা-চওড়া দু'একটা হাঁকড়ে দিলাম। অবিশ্যি ওর নাগাল পাব কি ক'রে, ভেতরে তো কিছু নেই, তবে গোড়াতেই মেয়েদের কাছে যে ক্রেডিট্টুকু নষ্ট হয়েছিল সেটা অনেকটা ফিরে এল। দু'দিন পরে সকলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।"

সদাশিব একটা নতুন বিড়ি ধরালেন, হুটুই দেশলাই জ্বেলে ধরল, প্রশ্ন করলেন—"জঙ্গলের ভেতরে তোমরা কেউ গেছ কখনো—?"

হুটু বলল—"গিয়ে থাকও তো বোলো না যেন কেউ। দাদু ভাববেন গল্পের ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে, সাবধান হোয়ে যাবেন।"

ধুঁয়াটুকু ছেড়ে একটু হেসে সদাশিব বলতে লাগলেন—

"গড়গড়ি সাহেব জঙ্গল বিভাগের অফিসার, জামাই এরকম বড় শিকারী টের পেয়ে খুশীই হোয়েছেন, বেশ ভাল ব্যবস্থাই করলেন। আমাদের বাসা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে ছুটো পাহাড় পেরিয়ে একটা বড় জঙ্গলে শিকারের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে আরও তুজন স্থানীয় শিকারী দিয়েছেন। চারজন লোক, চারটি বন্দুক। আমিও লেডিজদের সামনে ক্রেডিট্‌টা আর নষ্ট হতে দিলাম না।···অমরেশের কাছেই বা মিছে-মিছে খোওয়াই কেন? গিয়ে দেখি মাথা হয়েছে তুটি—পো'টাকের তফাতে। ঠিক হয়েছিল, আমরা তুজনে একটাতে বসব, ওরা তুজনে একটায়। সঙ্গে লোক রয়েছে, আমাদের উঠে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসতে সাহায্য ক'রে তারা নেমে চলে গেল।

গভীর জঙ্গল। প্রায় তুপুর হতে চলল, তখনও যেন বেশ অন্ধকার। জঙ্গলের নিজের কোন শব্দ নেই, একটা যে আছে, মাথা থেকে হাত-দশেক দূরে একটা মোষের বাচ্ছা বাঁধা ছিল, টোপ আর কি, তারই কাতরানি, তাতে যেন আরও ভয়ংকর করে তুলেছে জঙ্গলটাকে। পাশ-দিয়ে একটা ঝর্ণা গেছে নেমে। খাদ্য পানীয় তুয়েরই ব্যবস্থা ঠিক, এবার এলেই হয়। মাচাটি আমাদের ডালপালা লতাপাতা দিয়ে জঙ্গলের সঙ্গে মেলানো। চুপ করে বসে আছি তুজনে। আমি একবার মুখ খুলতে গিয়েছিলাম। অবশ্য ফিসফিসানিতেই, অমরেশ ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে ইশারা করল। কোথাও কিছু নেই অথচ একেবারে এতটা দরকার নাকি? যাইহোক্, এক্‌স্‌পার্ট তো, ওকেই গুরু মেনে আসা, চুপ করেই রইলাম।

মিনিট তুয়েকও যায়নি, একটা আওয়াজ উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অমরেশ আমার ডানহাতটা মুঠিয়ে ধরল—"দাতু, ও কিসের শব্দ? শুনতে পাচ্ছেন?"

ফিসফিস ক'রে নয়, চাপাগলাতেই, তবে বেশ স্পষ্ট, বসা-গলায় জোর দিলে যেমন শুনতে হয়। চোখ তুটোও একটু ঠেলে এসেছে, মুখটাও যেন ফ্যাকাশে!

বললাম—"বোধহয় তেমন কিছু নয়, তা ভিন্ন এখনও অনেক দূরে ; বোধহয় মাইল ছয়েক…"

"তা হোক দাছ, রেডি থাকা ভালো …ইয়ে…আপনি বন্দুক ছুঁড়তে জানেন তো ?"

বুকটা যেন একেবারে ধ'সে গেল ভাই। সর্বনাশ! কার ভরসায় এসেছি! তবু কোনও রকমে সাহসটা বজায় রাখবার জন্যে বললাম—"তা একটু-আধটু না জানলে এসেছি ?"

বন্দুক তুলেই নিলাম হাতে, বললাম—"তুমিও রেডি থাকো তাহলে।"

যেমন বেশী সবল হয়ে গেলে তেম'নি আবার বেশি দুর্বল হয়ে গেলেও তো ইংরিজী বেরিয়ে আসে আমাদের মুখে, বলল—"Excuse me dear Dadu—মাফ করবেন—I know shooting quite well--ভালো রকমই জানি কিন্তু এসব জঙ্গলে হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় ধরে শুনেছি—দেখুন তো—Have I caught it !"

নাড়ি দেখবার জন্যে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে যাকে বলে প্রস্তরবৎ নিশ্চল ! ওর দেখাদেখি সামনের দিকে চেয়ে আমারও অবস্থা তথৈবচ ; মনে হোলো এক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত রক্ত যেন নেমে গিয়ে অবশ ক'রে দিলে শরীরটা।

তখন প্রায় শ'দেড়েক গজ দূরে। একেবারে ফুল্ গ্রোন (Full-grown) বেঙ্গল রয়েল, সঙ্গে ছুটি বাচ্চা দেখে বুঝলাম শ্রীমতী--হল্‌দের ওপর লম্বা লম্বা কালোর টান—আস্তে আস্তে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছেন—তার'ই মধ্যে এক একবার পেছনের দিকে দেখেও নিচ্ছেন, তবে খুব বেশি যেন তাড়া নেই। মোষের বাচ্চাটা ক্লান্ত হয়ে চুপ ক'রে গিয়েছিল, বোধ হয় নজর প'ড়ে গেছে, চীৎকার করে ডেকে উঠতেই ভঙ্গি গেল বদলে। বোধহয় পোড়-খাওয়া বাঘিনী, বাঁধা খাবার দেখে আগের কথা কিছু মনে পড়ে গিয়ে সন্দেহ হয়ে থাকবে। কিন্তু সত্যিই সে কী অপরূপ ভঙ্গী !—একেবারে রাজকীয়ই—সেই দোলা

খেয়ে লাফানোটা গেল বন্ধ হয়ে। আস্তে-আস্তে থাবা ফেলে ডাইনে বাঁয়ে ওপর-নীচে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগুতে লাগলেন। তারপর বেশ খানিকটা তফাতে এসে থাবা মুড়ে বসলেন—পরিস্থিতিটা ভাল ক'রে বুঝে দেখতে চান। মোষের বাচ্ছা চুপ করে গেছে, জিভটা নিশ্চয় আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে।

একই অবস্থার মধ্যে অনেক সময় ক্ষেত্রবিশেষে উল্টোফল হয়। মোষের ঐ অবস্থা, কিন্তু একেবারেই চরমে এসে অমরেশের যেন সাড় ফিরে এসেছে। আমায় প্রায় জড়িয়ে ধরেই যেন নেতিয়ে পড়লো. বলল, "দাদু, শালী-শালাদের হাতে আমার প্রাণটা গেল আজ।"

আমার স্বভাব তো জানই, কথা পড়লে যমের সামনে দাঁড়িয়েও উত্তর না দিয়ে থাকতে পারি না, বললাম—"সে তো পুণ্যবানের মৃত্যু ভাই, কিন্তু তা আর হোতে পেলো কৈ ?···তবে ও দুটির সঙ্গে যদি নতুন সম্বন্ধ পাতাতে চাও তো, আলাদা কথা।···কিন্তু আস্তে কথা কও ; অবশ্য একেবারে না কইলেই ভাল।"

বললে—"হাতে প্রাণ যাওয়া মানে, ওদের কাছে বাহাদুরী নিতে গিয়েই যে যেতে বসেছে প্রাণটা। সুটিংয়ের শ'ও জানিনা দাদু, পারেন তো আমায় বাঁচান···"

বললাম—"তবে অতসী যে বললে ওর কাছে অত গল্প করতে···"

"বালীগঞ্জের তেতলায় ফ্যানের নিচে বসে গল্প দাদু। তার ফল যে এখানে এভাবে ফলবে···ওফ্ !···গুডবাই ডিয়ার দা···"

আর নয়, একেবারেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। বুঝলাম ঠিক যে জ্ঞানতঃ কথা কইছিল তা নয়, ভয়ের তাড়নে একরকম আধা চৈতন্যের অবস্থাতেই ভেতরের সত্যি কথাগুলো যেন আপনি বেরিয়ে আসছিল। নিচে ঐ, পাশে এই, আমি যেন একেবারে দিশেহারা হোয়ে পড়লাম প্রথমটা। ওয়াটার-বট্ল্ থেকে জোরে জোরে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম, নাড়াও দিলাম কয়েকবার। বারকয়েক ডাকলামও নাম ধরে, তারপর হঠাৎ হুঁশ হোল, ভুল কোরেছি এমন ভাবে জ্ঞান

ফিরিয়ে আনতে গিয়ে। প্রাণের ভয় নেই যখন, খানিকক্ষণ পড়ে থেকে আপনি আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসে সেই ভাল।

কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। ডাকটা নিশ্চয় একটু জোরেই হয়ে পড়েছিল ওরই মধ্যে, নাড়া দেওয়াটাও তাই—শ্রীমতী পরিস্থিতিটার নিশ্চয় তাৎপর্য বের করে নিয়েছেন—জলের কাছে বাঁধা খাদ্য, সামনের গাছপালা হঠাৎ নড়ে, তারমধ্যে মানুষের কণ্ঠ, নিশ্চয় এ নহে স্বপ্ন এ নহে মিথ্যা কাহিনী।

অমরেশের দিকেই আমার লক্ষ্য ছিল এতক্ষণ। সামনের দিকে নজর ফেলে দেখি, শ্রীমতী একদৃষ্টে এদিকে চেয়ে আছেন। শুভদৃষ্টি হোলো।

বসেই ছিলেন, উঠলেন, তারপর আস্তে-আস্তে এগুলেন; দুটি বাচ্চা দু'দিকে। হেলতে-দুলতে এসে মাচার খুঁটি থেকে দশ-বারো হাত দূরে পেছনকার পা দুটো মুড়ে সোজা হোয়ে বসে একটা যে হুঙ্কার ছাড়লেন তাতে মনে হোল, অমরেশ আগেই নিরিবিলিতে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। আমার কথা জিগ্যেস করবি?—যশ নিচ্ছি না, হয়েই এসেছে, তবে বংশের ধারা হচ্ছে সজ্ঞানে মৃত্যু; গঙ্গায় পা ডুবিয়ে! তাইতেই বোধহয় জ্ঞানটা হারাইনি একেবারে। তার সঙ্গে একটু-একটু বুদ্ধিও রয়েছে; একেবারে মরিয়া হয়ে গেলে যেমন একটু থেকে যায়। ওটা বুদ্ধিই কি নির্বুদ্ধিতা তা জানি না, তবে একটা শোনা কথা মনে আছে যে, বাঘের চোখের ওপর যতক্ষণ চোখ রাখা যায় সে নাকি কিছু করতে পারে না। তাই প্রাণপণে আছি চেয়ে। আর যাই হোক্, এই প্রাণপণ চেষ্টার জন্যেই একটা যেন জোরও পাচ্ছি মনে, আর তাইতেই বুদ্ধিটাও একটু কাজ করছে।...দিই নাহয় বন্দুকটা তুলে নিয়ে ট্রিগারটা টেনে? এটুকু বুদ্ধি আছে যে, বাঘের তিনচার হাতের মধ্যে দিয়ে যে যাবে গুলি তার কোনও সম্ভাবনা নেই, আর তা হলেই আর দেখতে নয়। তা'হলে করা যায় কি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ তো?

এক-একটা মুহূর্ত যাচ্ছে যেন এক-একটা যুগ, তারপর প্রলয় হোয়ে যুগ পাল্‌টাবারই অবস্থা এসে পড়ল। শ্রীমতী সামনের পা দুটো মুড়ে বসলেন, ল্যাজের ডগাটা একটু একটু নড়তে লাগলো। বুঝলাম সঙ্কল্প ঠিক হয়ে গেছে, এবার লাফ দেবেন। আমার বুদ্ধিটুকু নেভবার আগে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল, তাইতেই পাশে বেতের বাস্কেটের মধ্যে মুখোশটার কথা মনে পড়ে গেল।"

"কিসের কথা দাদু!"—কয়েকজন একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল। সদাশিব বললেন—"মুখোশের। সেকথা তোমাদের বলতে ভুলে গেছি। সে সময় আমার মেজছেলে অতুলের শখ চলছে, বাড়িতে একটা মিউজিয়াম করতে হবে—নানা জায়গার মৃৎশিল্পের। বাইরে গেলেই আমায় মাটির খেলনা, বাসন একটু আজগুবি দেখলেই কিনে আনতে হয়। সেদিন আসতে আসতে এক আদিবাসীদের গ্রামে একটা মুখোশ নজরে পড়ে যায়। একে মুখোশ, তায় আদিবাসীদের মুখোশ, সে যে কী উৎকট আন্দাজই করে নিতে পারিস। একজোড়া কিনে নিয়ে খাবার আর জলের বোতলের সঙ্গে বাস্কেটটায় রেখে দিয়েছিলাম, ওদিক থেকে চোখ না সরিয়ে আস্তে আস্তে হাত দুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে একটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে প'রে নিলাম। ওপরটা টুপির মতন, দড়ি বাঁধতে হয় না, ব্যস, নিশ্চিন্দি!"

ও বিড়টাও শেষ হোয়ে গিয়েছিল, ফেলে দিয়ে একটা নতুন বের করে নিতে হুটু আবার দেশলাই জ্বেলে এগিয়ে ধরল। গজানন প্রশ্ন করল—"তারপর দাদু?"

সদাশিব ধুঁয়া ছেড়ে বললেন—"তারপর আর কিছু হোলোই না তো বলব কি? মুখোশটা বসাতে সেকেণ্ড কয়েক দেরি হোয়েছিল, তারপর চোখের ছেঁদার সঙ্গে চোখ দুটো মিলতে আবার ওদিকে নজর গিয়ে পড়ল। মনে হোল ঠিক লাফটি দিতে গিয়ে শ্রীমতী যেন আবার মত বদ্‌লে চেপে বসলেন। পরিস্থিতি সম্বন্ধে আন্দাজটা আবার গুলিয়ে গেছে নিশ্চয়। ঠায় চেয়ে থেকে আবার একটা আওয়াজ

ছাড়লেন ; ঠিক সে রকম হুঙ্কার নয়, মাঝামাঝি কণ্ঠে একটা প্রশ্ন। আমি উত্তরটা দিলাম যথাসাধ্য জোরেই। প্রকাণ্ড মুখোশ, তায় ঘেরা-ঘোরা, নিশ্চয় অন্তত চারগুণ শক্তি নিয়ে পৌঁছে থাকবে আমার আওয়াজটা, আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন। ঠিক যে ভয় এমন কথা বলব না ভাই। তবে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন, কাজ কি ঝঞ্ঝাটে ?—ভাবটুকু কতকটা এই রকম। আস্তে আস্তে গজেন্দ্র গমনে চলে গেলেন। একবার মোষটার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে চাইলেন ; খানিকটা গিয়ে আবার এদিকেও, তারপর আর দেখা গেল না !"

গজানন প্রশ্ন করল—"আর অমরেশ বাবু, দাদু ! জ্ঞান হোল তাঁর ?"

সদাশিব বললেন—"আহা, ষাট ! বালাই ! জ্ঞান হবে না কেন ? অতসী না হয় না চেনে, বৌ বেচারা তো চেনেই, ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ে কপাল ফুলুচ্ছে ওদিকে, জ্ঞান হবে না ? তবে স্মৃতিটা বেশ স্পষ্ট নয়। রাস্তায় আসতে আসতে একবার আমায় বললে—"আমার যেন একবার মনে হোল বাঘ এসেছে দাদু ; স্বপ্ন কি সত্যি বলুন তো ?"

বললাম—"স্বপ্নই যথেষ্ট ভাই। সত্যি হোলে কি প্রাণটিকে শালী শালাদের হাতে ভেট দিতে ফিরে নিয়ে যেতে পারতে ?"

বোধ হয় কথাটা কিছুর সঙ্গে মিলে গিয়ে থাকবে, চোখ দুটো একটু তুলে একবার আমার দিকে চাইল, তারপর নামিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

সঙ্গীত-সদন

বহুদিন পূর্বের কথা, আমি তখন স্থানীয় এক জমিদারের চাকরিতে রয়েছি। সেরেস্তায় নয়। তাঁর ছেলেকে পড়াই। এদিকে ইংরাজী চিঠিপত্র বা ঐ ধরনের কাজ যাতে ইংরাজী জ্ঞান দরকার সেগুলোও আমার এলাকাতেই থাকে। কতকটা গৃহ-শিক্ষক-সংযুক্ত প্রাইভেট-সেক্রেটারির কাজ। এর আগের কাজটায় ছিল অসম্ভব রকমের খাটুনি, উদ্বেগ আর দৌড়ধাপ, সেজন্য সুযোগ পেতেই ওটা ছেড়ে দিয়ে আমি এটা ধরে নিই। চাকরি-জীবনে এরকম সাময়িক বানপ্রস্থ কয়েকটা গেছে আমার।

এটা ছিল কঠোর বানপ্রস্থ। জায়গাটা নিকটতম রেল-স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে, একেবারে অজ পাড়াগাঁ। এর ওপর গাঁ বলতে যেটুকু বা রয়েছে, আমি ছিলাম তা থেকেও একেবারে বিচ্ছিন্ন। শ' চারেক বিঘার একটা খোলা জায়গার মাঝখানে জমিদারবাবুর মহল, সামনে খানিকটা খোলা মাঠের পর বিঘা পাঁচিশেক নিয়ে একটা পুকুর, বাঁ দিকে হাতিশাল, তারপর খানিকটা বাদ দিয়ে গ্রামের চালাবাড়িগুলো আরম্ভ হয়েছে। মহলের ডান দিকে, বেশ খানিকটা তফাতে আমার ছোট বাসাটা। দুখানা ঘর, রান্নাঘর, স্নানের জন্য একটা শান-বাঁধানো চাতাল। মাঝখানে একটা ছোট্ট উঠানসুদ্ধ, সবটুকু একটা নীচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আমার ডান দিকে টানা আমবাগান, তারপর ধানের ক্ষেত, তার ওদিকে অনেক দূরে অন্য এক গ্রাম।

আগের কর্মজীবনের উদ্বেগ, চঞ্চলতার জন্য প্রথম কটা দিন বেশ চমৎকার লাগল। অল্প কাজ, সকাল-বিকাল মিলিয়ে বার দুইয়ে ঘণ্টা চারেক পড়ানো, খানিকটা চিঠি পত্র দেখা ; এর পর বাকি সমস্ত সময়টুকু একেবারে শীলমোহর করা আমার নিজস্ব।

আমি সকালে-বিকালে পড়িয়ে এসে আমার চৌকির বিছানাটিতে বালিশে বুক চেপে থাকতাম পড়ে। সামনেই ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালে খোলা জানলা। এটা আমার বাসার পেছন দিক। ঠিক জানলার নীচে হাত চারেকের পরেই মহলের চারিদিকের পরিখাটা শুরু হয়ে সোজা শ' খানেক গজ পশ্চিমে চলে গিয়ে উত্তরে চৌহদ্দির দেয়ালের আড়ালে ঘুরে গেছে। একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত ধানের ক্ষেত। শরৎকাল, নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ জলে ক্বচিৎ শিহরণের মতো এখানে ওখানে একটু বীচি-ভঙ্গ। জমিদারেরই একটা রাখালছেলে পরিখার ধারে গোটা তিন মোষ চরাত। কখন কখন জলে নামিয়ে দিত। শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে তাদের তৃপ্ত ফোঁস-ফোঁস শব্দ, বা বহু দূরে একটা চিল বা ঘুঘুর ডাক।

ঠিক জানলার নীচেই একটা অজ্ঞাতনামা কি বনফুলের গাছ। গন্ধটা বরং কটুই, তবে সুপুষ্ট ঘননীল পাতার মধ্যে স্তবকে স্তবকে ফুল রয়েছে ফুটে। কমলা আর গোলাপের মিশ্রণে অদ্ভুত রংটা গন্ধের কথা ভুলিয়েই দেয় যেন।

আমার এদিকে যেটুকু বা জীবন আছে—নিজের বাসার ঠাকুরচাকর, জমিদারের মহল, তার ওদিকে বিরলবসতি গ্রাম—সেটুকুও মুছে ফেলে সামনে চেয়ে পড়ে থাকি। কোন বই-খাতাও নয়; তার মধ্যেও অপ্রত্যক্ষ জীবনের যে গুঞ্জন থাকে সেটুকুকেও প্রবেশ করতে দিতে মন সরে না।

বেশ কাটতে লাগল।

কিন্তু বেশি দিন নয়। ধীরে ধীরে এই নিঃসঙ্গতা অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। বিশেষ করে এই নৈঃশব্দ, যা নাকি সবচেয়ে বেশি শান্তি এনে দিয়েছিল প্রথম প্রথম। পাশেই জমিদারবাবুর দেউড়ি, কিন্তু সেটা যেন একটা ঘুমন্তপুরী। বিরাট তিনমহল দেউড়ির মধ্যে পরিবারটি নিতান্তই ছোট। আমার মনিব বৃদ্ধ; তাঁর অশীতিপরা জননী; গৃহিণী আর ঐ একটি ছেলে, আমার ছাত্র। মনিব নিজেই দুবেলা জমিদারির কাজকর্ম দেখেন, সেজন্য কর্মচারীর বাহুল্য মোটেই নেই। যখনই যাই

দেখি কর্তা শতরঞ্জি-পাতা মেঝেয় একটা গদির ওপর গির্দায় হেলান দিয়ে বসে আছেন, ফতুয়া-পরা গুটি তিন-চার এদেশীয় কায়েত কর্মচারী খেরুয়া খাতায় শরকাঠির কলম দিয়ে নিঃশব্দে লিখে যাচ্ছে। জমি-দারির কলকব্জাও এমন মসৃণ গতিতে চলেছে যে, পাইক-বরকন্দাজ দুটো লোক ধরে নিয়ে এল, মারপিঠ-ধমক-ধামক হোল, পাঁচটা লোক জড়ো হল—এ-জাতীয় দৃশ্যও কখনও চোখে পড়েনি। গ্রামটা ছোট্ট, তায় দেউড়ির একরকম সংলগ্নই বলতে গেলে : সুতরাং স্বপ্নপুরীর নিদ্রাভঙ্গ যাতে না হয় সে বিষয়ে খুব সতর্ক। এদিককার পুকুর-ঘাটটাও ঐ সুরে বাঁধা, স্নান আছে কিছু কিছু, জলে শব্দ আর তরঙ্গ তুলে সাঁতার নেই মোটেই।

পড়াতে যাই, ছেলেটিও এত অল্পভাষী, তদুপরি মৃদুভাষী যে মনে হয় পড়েছে না, যেন ঘুমের ঘোরে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখছে। বেশ মেধাবী, অল্পে বুঝে যায়, যার জন্যে খানিকটা বক-বক করে যে নিজের কণ্ঠের স্বরটুকুও শুনব তারও উপায় নেই।

অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। অনুভব করতে লাগলাম সকাল থেকে নিয়ে সমস্ত দিন আমি যেন একটি অটল-অনড় স্তব্ধতার গহ্বরে ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়ে চলেছি।

আমার বাসায় একটি পাচক-ঠাকুর আর একটি চাকর, স্থানীয় ভাষায় 'টহ্‌লু'। ফরমাশের আগে কাজ করে বসে থাকে। এত দুঃখের মেঘে একমাত্র রজত-রেখা পাচকঠাকুর কল্লড় ঝা বদ্ধ কালা। আমি শুয়ে শুয়ে কান পেতে থাকি কখন আমার টহ্‌লু মুশরবা তাকে একটা কথা বোঝাতে চাইবে, ঘুমের মধ্যে একটু পাশমোড়া দেবে আমাদের এই ঘুমন্তপুরী। ভাবি, পাখিরাও কি বর্জন করলে জায়গাটাকে, রইল শুধু দুটো শব্দ-কুণ্ঠ চিল আর ঘুঘু!

জীবন যে জীবনকেই চায়, নৈঃশব্দ যে মৃত্যুরই ছায়া একথা এমন-ভাবে পূর্বে কখনও উপলব্ধি করি নি।

এই রকম যখন অবস্থা যাচ্ছে, তখন শব্দ-সুন্দরী একদিন একেবারে নূপুর-শিঞ্জন তুলে উপস্থিত হলেন আমার কাছে।

দুটো দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময় ফেরবার কথা, গাড়ির গোলমালে দেরি হয়ে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম বাসায় তখন বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেছে। চাকরটা এখানেই থাকে, পাচক-বামুনটা আসে গ্রাম থেকে; দুটোর কোনটাই নেই। আজ এলাম না মনে করে পাচকটা নিশ্চয় এসে ফিরে গেছে খানিকটা টহল দিয়ে আসতে। সদর দেউড়ির একটা লোককে তাদের ডেকে আনতে বলে বাসার দিকে আসছি, হঠাৎ বাজনার আওয়াজ কানে গেল। একটা ক্ষীণ মিশ্র আওয়াজ রিন্ রিন্ ঠুন্-ঠুন্—মনে হয় সেতার বা বীণ আর মন্দিরা, তার সঙ্গে বাঁয়া-তবলার বোল। আওয়াজ আসছে আমার বাসার ডান দিকে যে আম-বাগানটা তার ওদিক থেকে। আমি আমার দরজা ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই দেখি লোকটা চাকর আর পাচকটাকে সঙ্গে করে আম-বাগানের দিক থেকেই চলে আসছে। দরজা খোলা ছিল, আমি হাতপা ধুয়ে বারান্দায় একটা চেয়ার বের করিয়ে বসলাম। ওরা দুজনে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল।

সঙ্গীতটা একবার থেমে গিয়ে আবার নূতন সুর নূতন তালে আস্তে আস্তে আরম্ভ হলো। দূরের আওয়াজ, তার ওপর ঘন-সন্নিবিষ্ট আম-বাগানের বাধাটাও রয়েছে, তবু দিনের সেই সামান্য শব্দতরঙ্গ মিলিয়ে গিয়ে সমস্ত জায়গাটা এমন নিরেট হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে যে, ক্ষীণ হলেও সঙ্গীতের সমস্ত রূপটুকুই একরকম ধরা পড়ছে আমার কানে। প্রথমটা ছিল 'দেশ', এটা 'বাগেশ্রী'। শব্দহীন ভূমিতে শব্দ পেলাম ত একেবারে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে, তাও আমার অতি প্রিয় দুটি সুরেই; আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগলাম।

একটু চমকই লাগল চাকরটা যখন পাশে এসে এত্তালা দিল ঠাকুর বলছে খাবার তৈরি, আদেশ করি তো ব্যবস্থা করা হয়।

তাড়াতাড়িই রেঁধে দিতে বলেছিলাম, তবু এত শীঘ্র কখন্ তোয়ের হল? ঘুমিয়েই পড়েছিলাম নাকি আমি? আশ্চর্য নয়, তিন মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে আসার ক্লান্তি, তার ওপর এই ঘুমপাড়ানো গানই তো, হয়তো এসেই গিয়ে থাকবে একটা তন্দ্রা। ইচ্ছা ছিল না খাওয়ার, কিন্তু পাছে রীতিমতো ঘুমিয়েই পড়ে সঙ্গীতটুকু থেকে একেবারে বঞ্চিত হই সেই ভয়ে দিয়ে দিতেই বললাম।

লুচি কখানা হয় একেবারে কাঁচা, নয় তো একেবারে পোড়া। একটু ছোলার ডাল আর আলুর দম করেছে, তাও একটা কাঁচা, একটা পোড়া, একটা আলুনি, একটা নুনে বিষ। বাজনার মাঝখানে বেসুরো কিছু তুলব না বলেই নিঃশব্দে খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লাম। কালা বলেই কল্লড় ঝা খুব কম কথা কয়, আমার সঙ্গে কয় না বললেই চলে, শুধু একবারটি করে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে নেয় রান্নাটা কেমন হয়েছে। রাঁধে ভালো, উত্তরটা অনুকূলই হয়, আজও সেই উত্তরই নিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। মেঠো রাস্তা হয়ে অন্ধকারে যেতে হয় বলে লাঠিতে দুটো ছোট ছোট লোহার চাকতি আলগাভাবে বসানো থাকে; ঝমঝম শব্দটা আস্তে আস্তে আম-বাগানের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরও প্রায় ঘণ্টা খানেক আরও; চলল বাজনা; প্রায় দশটা পর্যন্ত। বন্ধ হয়ে যেতে আমিও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মুশরবা খেয়েদেয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করে এই ঘরেরই মেঝেয় তার বিছানা পেতে শুয়ে থাকবে। পরিশ্রান্ত ছিলাম, ঘুম আসতে দেরি হল না। ইচ্ছা ছিল জিজ্ঞেস করব হঠাৎ বাজনা এল কোথা থেকে, থাকবে কি না কিছুদিন; সেদিন আর হয়ে উঠল না।

তার পরদিনও নয়। এর পর হঠাৎ ইংরাজী চিঠিপত্রের কাজটা বড় বেড়ে গেল কয়েকদিন ধরে। মনিবের জন্য ইংরাজীতে একটা অভিভাষণও লিখে দিতে হবে, একটা সভায় আহূত হয়েছেন; এই সব নিয়েই ব্যস্ত রইলাম। সন্ধ্যার পর বাসাতেই বসে লিখি, বাজনাটা সিনেমার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মতো চলতে থাকে, কখনও শ্রুত,

কখনও অশ্রুত; ও সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ করা হয়ে ওঠে না। কাজ রয়েছে হাতে, সুতরাং ঔৎসুক্যও তো নেই আর ততটা।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। রান্নার সেই যে দুরবস্থা, সেটা যেন আর যেতে চাইছে না। দিনের বেলা নয়, ধরতে গেলে দিনের বেলা বরং আরও একটু ভালোই হয়েছে, কিন্তু রাতের খাবার দিন দিনই যেন অখাদ্য হয়ে উঠছে। লক্ষ্য করলাম একটা তাড়াও যেন লেগে থাকে কল্লড় ঝার। তাড়াতাড়ি সেরে আমায় খাইয়ে লাঠি বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে পড়ে। মনটা অন্যদিকে থাকায় টোকাও হয় না।

তারপর একদিন আপনিই টের পাওয়া গেল ব্যাপারটা।

ওদিকের ল্যাঠা চুকে গেছে। মিটিংয়ের হাঙ্গামেও খানিকটা মেহনত গেছে সেদিন, সন্ধ্যার পর নিশ্চিন্ত হয়ে বারান্দায় বসে আছি। মুশরবা এসে প্রশ্ন করল—"আজ আপনি সকাল-সকালই খাবেন?"

প্রশ্ন করলাম—"কবে দেরি করে খাচ্ছি?"

একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল—"না, কল্লড় ঝা জিজ্ঞেস করছে।"

বললাম—"সকাল সকাল খাব না, তবে আরম্ভ করে দিক। আর বলবি একটু ধীরে-সুস্থে রাঁধতে, ক' দিন একেবারে খাওয়া হয়নি। এত তাড়াহুড়া করে কেন বল দিকিন্?"

আরও একটু হকচকিয়ে গেল মুশরবা। আমিই বললাম—"উঠানে ধানের বোঝা এসে গেছে বুঝি? আগলাতে হয়?"

মুশরবার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন আমার প্রশ্নেই মনের মতো একটা জবাবদিহি পেয়ে গিয়ে বলল—"জী, হাঁ মালিক। গরীব মানুষ তো, নিজে না আগলালে চলে না।"

"তা হলে বলে দিস, ধান মাড়াই না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যেমন সকাল সকাল যাচ্ছিল তেমনি চলে যাবে। আজ দেরি হয়ে গেছে, না হয় রান্না করে ঢেকে রেখে চলে যাক, আমি খেয়ে নোব'খন।

তাই করুক, সকাল সকাল খেতে পারব না। তুই বরং আয়, আমি শুতে যাচ্ছি, গা-টা টিপে দিবি একটু।"

গা টেপাবার সময় আমরা একটু আলাপ-প্রবণ হয়ে পড়ি। গাঁয়ের রাজনীতি, মুশরবার নিজের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা, জমিদারবাড়ির নূতন-পুরাতন কাহিনী—যা এসে পড়ে। চাকরটা একটু হ্যালা-খ্যাপা আহ্লাদে-আহ্লাদে গোছের, প্রাণ খুলে দিয়ে গল্প করে এখানকার মিঠে গ্রাম্য-ভাষায়। এদিকে আমিও কোন ব্যবধান রাখি না। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটা একরকম ঘুচিয়ে দিয়েই দরদের সঙ্গে প্রশ্ন করি, মন্তব্য করি। ফলে ওর মনের কপাটটা একেবারে উন্মুক্ত হয়ে যায়, কিছু রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারে না, আর যদি কিছু অনুযোগ করতে হল তো এই সময়েই করে দেয় বা কিছু চাইতে হল তো এই সময়েই নেয় চেয়ে।

আজ কল্লড় ঝা নিয়েই গল্পটা বলল। প্রথমে ওর পারিবারিক জীবনের কথা।···কল্লড় ঝাকে আজ রাঁধুনি-বামুনের কাজ করে খেতে হচ্ছে, তাও কার, না, একজন বাঙালী বাবুর, যারা নাকি টিকি পর্যন্ত রাখে না, মুরগির আণ্ডা খায়। না, আপনার কথা হচ্ছে না মালিক, আপনি তো পাকা বামুন, নৈলে বাবুসাহেব দেউড়ির মধ্যে স্থান দেন?··· আণ্ডা খায় তারা, গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে প্রাণ যায় কল্লড় ঝার। বাবু সাহেব পিঠের ওপর না থাকলে হয়তো এক-ঘরেই করে দিত এতদিন, (এবার চুল কাটাবার সময় মাথার মাঝখানে আঠানি-ভর একটু ছেড়ে দেবেন হুজুর, বেটাদের তর্ক করা বেরিয়ে যাবে), এই রকম বিপদের মধ্যে রাঁধুনি-বামুনের কাজ করে খেতে হতো না ওকে, কিন্তু শখের পেছনেই লোকটা একরকম বলতে গেলে বিকিয়ে গেল কিনা। শখ মানে অবশ্য কোনরকম নেশা বা বদ-খেয়াল নয়, সেদিকে কল্লড় ঝা একেবারে খাঁটি মানুষ, ওর শখ হলো গান-বাজনা···

নিজের মনেই বলে যাচ্ছিল, আমি সচকিত হয়ে বললাম—"কিন্তু ও তো বদ্ধকালা।"

—কালা হলে কি হয়, ভয়ানক ঝোঁক কল্লড় ঝার গান-বাজনায়। আজকের কথা নয়, যখনই দেউড়িতে বা আশেপাশে কোথাও কোন ভালো গাইয়ে-বাজিয়ে এসেছে, কল্লড় ঝা সঙ্গ নিয়েছে, সুবিধে পেলে নিজের বাড়িতে রেখে তার পেছনে ঢালোয়া খরচ করেছে—অবস্থা তো একরকম ভালোই ছিল—ঐ করে করেই না খারাপ করে ফেলেছে এদিকে।

প্রশ্ন করি—"কিছু শিখতে পেরেছে ?"

—একেবারে যে না শিখেছে তা নয়, তবে কালা মানুষ তো, সুরে তালে মেলাতে কষ্ট হয়। তবে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়, এখনও লেগে আছে, আবার একটা নতুন সুবিধে হয়েছে তো···

প্রশ্ন করলাম—"কেউ এসেছে নাকি নতুন গাইয়ে-বাজিয়ে ? কদিন থেকে বাজনা কানে আসছে যেন আম-বাগানের ওদিক থেকে ?"

হাতটা একটু থামিয়ে ফেলে একটু কুণ্ঠিত হাসি মুখে নিয়ে মাথা হেঁট করে রইল মুশরবা। ওর আবদার করবার ভঙ্গি, বলল—"মালিককে সেই কথাই বলব বলব করছি ক'দিন থেকে, কল্লড় ঝাও বলছে আমায়, কিন্তু মালিকের অসুবিধে হবে বলে বলতে পারছি না।"

"কথাটা কি ?"—জিগ্যেস করি আমি।

"ঐ যে বললাম না—খামারে ধান আগলাতে যায় কল্লড় ঝা ?—ওটা মিথ্যে কথা নয় হুজুর, তবে সে পরে। এখান থেকে সোজা মহাবীরস্থানেই যায় আগে। একজন বাবাজী এসেছেন বাইরে থেকে, সেতারে হাত খুব ভালো। এ ছাড়া আরও অনেক রকম যন্ত্র জানা আছে। সবাইকে তালিম দিচ্ছেন, বলছেন শিখিয়ে নিয়ে একটা ইস্কুল খুলবেন এখানে, খুব সাড়া পড়ে গেছে গ্রামে। কল্লড় ঝাও যাচ্ছে, বলছিল—

মালিক যদি তাড়াতাড়ি খেয়ে নেন তো সকাল সকাল যাই একটু, মুশরবা বলে দেখিস না একবার। আমি বললাম—"তা হলে তো আমারও সুবিধে হয়। কিন্তু মালিক কি মেহেরবানি করবেন?"

প্রশ্ন করলাম—"তোর সুবিধেটা কিসের?"

এবার আর একটু বেশিক্ষণ সেইভাবে ঘাড় হেঁট করে রইল।

আমি বললাম—"বল্ না। না হয় খেয়েই নোব একটু সকাল, সকাল, তাতে আর হয়েছে কি?"

বলল—"আমিও শিখছি কিনা; আপাতত বাঁয়া-তবলা, এরপর পাখোয়াজ ধরব মালিক।"

উৎসাহের স্রোতের টানে আমিও গেলাম পড়ে। নিজে শেখা নয়, তবে এরকম অজ পাড়াগাঁয়ে সঙ্গীত-চর্চার আয়োজন হচ্ছে, এটা বড় ভালো লাগল আমার। এরা যে-সুযোগটুকু চায়—সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে ওদের ছুটি দেওয়া, তার ব্যবস্থা তো হলই, একদিন নিজেও মহাবীরস্থানে গেলাম। আটচালাটার মধ্যে তালপাতা আর খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে জন পনেরো লোক জড়ো হয়েছে, বেশির ভাগই মুশরবার মতো যুবা; কল্লুড়ের মতো মাঝবয়সী বা আধাবুড়োও রয়েছে কয়েকজন। অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র যোগাড় হয়েছে—সেতার, এস্রাজ, হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, মন্দিরা, করতাল, একটা বড় চিমটা যা বাজিয়ে বাবাজীদের গান করতে দেখেছি, আরও দু'একরকম যন্ত্র যা এইসব দিকেই বেশি চলে। একটা পেট্রোম্যাক্স আলোও যোগাড় করেছে। আমি যাব ওরা এটা আশা করতে পারেনি, খুব আদর-অভ্যর্থনা করল। বাবাজীর সঙ্গেও পরিচয় হোল। বললেন অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, ওঁর জীবনের ব্রতই এই: যাতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলোচনা বাড়ে, ভজন-পূজনের সহায়ক হয়, তার উদ্যোগ ক'রে বেড়ান। এক এক জায়গায় সুবিধা বুঝে এইরকম এক একটা আড্ডা করে দিয়ে চলে যান, দুমাস তিন মাস যেমন দরকার থেকে

গিয়ে, তারপর আবার ঘুরেফিরে এসে দেখে যান কেমন চলছে না চলছে। এ জায়গাটায় সঙ্গীতের চর্চা ছিল, তারপর যেমন আমাদের পুরাতন সংস্কৃতির সব জিনিসই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তেমনি এটাও যেতে বসেছে, উনি একটু চেষ্টা করে দেখছেন।

তাই দেখলামও। যারা উপস্থিত হয়েছে তারা সবাই যে শিক্ষার্থী এমন নয়। আমার অভ্যর্থনায় সেদিন একটু ভালো করেই জলসার আয়োজন হল ; দেখলাম যারা বয়স্থ গোছের তারা সকলেই কোন-না-কোন একটা যন্ত্রে কম-বেশী করে দক্ষই। কল্লড় ঝাও রয়েছে তার মধ্যে, আমি থাকার জন্যই বোধ হয় আগে এগুতে চাইল না, তারপর দুখানা বাজনা হয়ে যাওয়ার পর মন্দিরাটা নিয়ে প্রথমটা একটু মুখ ফিরিয়ে আরম্ভ করে দিল, বেশ রেখেও গেল তাল দেখলাম, হয়তো সবাই ঠিক নিজের তালে আছে বলেই।

বেশ একটি ঝোঁকের মধ্যে পড়ে গেলাম। মাঝে মাঝে যাই, আমার জন্যে একটা চেয়ারেরও ব্যবস্থা করে রেখেছে ওরা। কাজও এগুচ্ছে। তারপর আমি সবার উৎসাহটা আরও দিলাম বাড়িয়ে। একদিন গিয়ে বললাম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে মাঝে মাঝে পুরস্কার দেওয়ার আয়োজন করলে ভালো হয়। সবাই খুব রাজী। মাসখানেক পরে প্রথম প্রতিযোগিতার দিন স্থির করা হল। এতে থাকবে সেতার, তবলা আর মন্দিরা। বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল।

আড্ডাটার একটা নামও ঠিক ক'রে দিলাম—"সঙ্গীত-সদন।"

আমার মনিব জমিদারবাবুকেও টানবার ইচ্ছা ছিল। তবে সম্ভব হল না। একেবারে সেকেলে মানুষ, প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার অভ্যাস নেই, বয়স আর স্বাস্থ্যের ওজুহাত দেখিয়ে কাটান্ দিলেন। তবে আমার ছাত্রকে দলভুক্ত করলাম খানিকটা। ওঁকেই বললাম—যুগ পালটাচ্ছে, আস্তে আস্তে এই দূরত্বের ভাবটা কমিয়ে আনাই ভালো। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রাজী হলেন। ওদের জানিয়ে দিলাম পুরস্কারগুলো আমার ছাত্রই বিতরণ করবে।

এর পরের পুরস্কারগুলোর মূল্যও ওই বহন করবে। তবে সেটা আপাতত নিজের মনেই রাখলাম। উৎসাহের জোয়ারটা ঢেউয়ের ওপর ঢেউয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। এবং অবশেষে একটা বড়গোছের ঢেউ উলটে আমার মাথার ওপরও এসে পড়ল।

নির্জনতার সঙ্গে মাথায় টাক পড়ার কোন সম্বন্ধে আছে ?

ক'দিন থেকে মনটা বড় খারাপ যাচ্ছে ; বিকেলে পড়িয়ে এসে ঐ চিন্তাটাই মনটাকে দখল ক'রে বসে।

মুশরবা মাথার ব্রহ্মতলে, যেখানটায় আটানি-ভর একটা জায়গা নিয়ে একটু বেশি চুল ছেড়ে দিয়ে টিকি রাখবার জন্যে সেদিন সুপারিশ করেছিল, দেখছি, চুল রাখা তো পরের কথা, সেখানে উলটে দ্রুত টাক পড়ে আসছে। গোটাচারেক আটানি একত্র করলে যতটা হয় ততটা প্রায় তেলা হয়ে গেছে, তারপরে যেন সামনের দিকে এগিয়ে আসার লক্ষণ। বিশেষ অশান্তিতে আছি। মহাবীরস্থানে অনেকদিনই যাইনি। একে এই মনোকষ্ট, তার ওপর নূতন শীত পড়েছে, শরীরটাকে আরও যেন জবুথবু ক'রে ফেলেছে। কল্লড় ঝা সন্ধ্যার পরই খাইয়ে দিয়ে চলে যায়। আগে মুশরবাও এই সঙ্গে চলে যেত, আমি খানিকটা লেখাপড়া নিয়ে কাটাতাম। ঘণ্টা দু'তিন পরে ও এসে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে ঢুকত। খানিকটা গা-হাত টিপে দিত, তার মাঝেই পড়তাম ঘুমিয়ে। ও-ও মশারিটা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ত। আজকাল আর ওকেও যেতে দিই না। আগার সেরে লেপ ঢাকা দিয়ে আমি কোন মাসিক সাপ্তাহিক পত্র, পাঁজি, কবিরাজী বিজ্ঞাপনের পুস্তিকা পড়তে থাকি—টাক সম্বন্ধে কোথায় কে কি বলছে ; তারই মধ্যে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্ন দেখি—কোনদিন যেন মাথায় চুল আর ধরছে না, আবার কোনদিন টাক যেন বানের জলের মতো হু-হু ক'রে ছড়িয়ে পড়ে সব নিশ্চিহ্ন ক'রে দিচ্ছে।

মুশরবাকে আমি ছেড়ে দিতে পারতাম ; এই প্রতিযোগিতাতেই

নাকি অংশ গ্রহণ করতে চায়। ছেড়ে দিতাম, কিন্তু ওর গা টেপার পদ্ধতিটা বড় লোভজনক। অনেকটা ম্যাসাজ গোছের। জাতিতে দেশীয় নাপিত, ওদের এটা ঘরানা জিনিস। টিপে, ঘষে, মুচড়ে, চাপড়ে, তালি বাজিয়ে, তড়বড় করে আঙুলের ঘা দিয়ে পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন একটা স্বস্তির ভাব এনে ফেলে যে বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি টেরও পাই না। মনের যা অবস্থা যাচ্ছে, বড় লোভনীয় হযে উঠেছে এটুকু। ওকে বলেছি, যা শিখছে, আমি যখন বাসায় থাকব না তখন তার রেয়াজ করবে। কটা দিন যাওয়া বাদ দিক এখন।

সেদিন রবিবার, ওদের স্কুলটা এই একটা দিন বন্ধ থাকে। আমার মনটাও ভালো আছে। একটা ভালো তেলের সন্ধান পেয়েছি এখান থেকে খানিকটা দূরে এক মৈথিল কবিরাজের কাছে, আজ সেটা এসেও গেছে।

একটা বইও বের করেছেন উনি বিজ্ঞাপনের জন্য। তাতে বলছেন তেলটা চ্যবনপ্রাশ জাতীয়। এক্ষেত্রে যেমন লুপ্ত যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্যে উনি রসায়নটা বের করেন, তেলটা তেমনি কোন এক মহর্ষি নাকি মাথার দ্রুত কেশহীনতা নিবারণ করবার জন্যে করেন আবিষ্কার। সত্যিই তো, কোন মুনি-ঋষির চিত্রে তো মাথায় টাক দেখিনি। বেশ একটু আশান্বিত হয়ে উঠেছি।

ভালো করে রান্নার কথা বলে দেওয়া হয়েছে কল্লুড় ঝাকে। সে ওদিকে রাঁধছে। সব যোগাড়যন্ত্র করে দিয়ে মুশরবা এসে গা-হাত-পা টিপতে আরম্ভ করল। আমি শুয়ে শুয়ে বইটা পড়ছি; হিন্দিতে লেখা। টেপার কাজ শেষ হয়ে গেলে মুশরবা তেলটা মালিশ করবে টাকে।

তাড়াহুড়া নেই, বলে দিয়েছি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তো নিতান্ত বেশি রাত না হয়ে গেলে যেন না ওঠায়।

একটি চমৎকার স্বপ্নের মধ্যে থেকে আমি আপনিই এক সময় আস্তে আস্তে জেগে উঠলাম। বড় বড় গুণীদের একটা জলসা বসেছে, সঙ্গীতের মূর্ছনায়, সঙ্গতের মিষ্টি বোলে সমস্ত বাতাসটা গেছে ছেয়ে। সুর আর দ্রুত সঙ্গত ক্রমাগতই ঘুরে ঘুরে সমের মাথায় এসে পড়ছে, তারই মধ্যে ঘুমটা ভেঙে গিয়ে ধীরে ধীরে আমার চোখ দুটো খুলে আসছিল, ব্যাপারটুকু বুঝে নিতে যা সেকেণ্ড কয়েক দেরি হোল, তারপরে আমি আবার ধীরে ধীরে, জানাজানি না হতে দিয়ে, বুজে নিলাম সে দুটো। স্বপ্ন ভেঙে গেলেও সঙ্গীতটা তখনও চলছে।

নিশ্চয় খানিকটা রাত হয়ে গেছে। ঘরের দরজা খানিকটা খোলা। কল্লড় ঝা রান্নাঘর থেকে চিমটেটা নিয়ে এসে বড় পেরেকের মতো একটা লোহা দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে প্রবলবেগে চোখ বুজে যাচ্ছে বাজিয়ে ; মুশরবা আমার ঠিক টাকের ওপর তবলার বোল তুলে চলেছে ! এখনও তেলটা দেয়নি, তেলা তবলায় তো বোল উঠবে না। খড়ির অভাবে চুন দিয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না, হয়তো দেয়ালের চুনে হাত-ঘষে নিয়ে থাকতে পারে হাতটা।

দুন্—চৌগুণে চলেছে সঙ্গীত আর সঙ্গত।

হতভাগা রোজ এইক'রে আমার মাথার ওপর রেয়াজ করে তাহলে, আজ হয়তো সঙ্গ পেয়ে আরও জোর মেতে উঠেছে। খৈনি-খাওয়া, বাসনমাজা, কাঠ চ্যালা-করা হাত, তবলার চামড়াটা যে ছিঁড়ে যায়নি এত দিনের রেয়াজে, এই যথেষ্ট।

নেহাত কথা দিয়েছি, পুরস্কার তিনটে দিয়েছিলাম পাঠিয়ে।

টাক নিয়ে এমন পড়তে হল যে সঙ্গীত-সদনের কি পরিণাম হল সে-খোঁজ রাখবার আর অবসর পাইনি।

রামরতন

মাঝপথে ট্রেনেই অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

ধাক্কাটা বেশ বড় গোছেরই ছিল। প্রায় সম্বিৎহারা হয়ে পড়ি, যেটুকু বা ছিল, নাড়াচাড়া করে স্ট্রেচারে তুলতে সেটুকুও হারিয়ে ফেলি। যখন ফিরে এল সম্বিৎ, দেখি আমি হাসপাতালের একটি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ঘরে, দুইজন ডাক্তার এবং তিন-চারজন নার্স ঘিরে আছেন, চিকিৎসা চলছে।

সম্পূর্ণ একটা নূতন অভিজ্ঞতা জীবনে। প্রথমটা একটা যেন অসার ভাব লেগে রইল খানিকক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে স্মৃতি ফিরে আসতে বড় অসহায় বোধ হতে লাগল ; কোথায় বাড়ি-ঘর, যেখানে যাওয়ার কথা সেও কতদূর, মাঝখান থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক যাত্রার আয়োজন। সমস্ত দিনটা অদ্ভুতভাবে কাটল। চিকিৎসা আর শুশ্রূষার গুণে সামলে আসছি, কিন্তু তার অনুভূতিটা খুবই ক্ষীণ! সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন, সাহস দিচ্ছেন, কিন্তু যতই বয়স বাড়ে, জীবনের অভিজ্ঞতায় সাহসকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতাটা হারাতেই হয় বরং। জানিতো, নিজেই কত সান্ত্বনা আর সাহস দিয়েছি জীবনে, আর তাতে শতকরা ভেজালের পরিমাণটা কত বেশি থাকে।

বড় অসহায় বোধ করছি। ঠিকানা নিয়ে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু···

রাত্রি এসে পড়ল, এবং সেটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অসহায়-বোধটাও বেড়ে যেতে লাগল আমার। মনে হোল যে-আঁধারটা দিনমানেই ঘিরে ফেলেছিল আমায়, সেটা যেন এইবার একটা স্পষ্ট আকার গ্রহণ করছে। রাত আটটা-নয়টায় নার্স, সর্দার এবং অন্যান্য স্টাফ বদলি হয়ে যাওয়ায় পরিচিত মুখের অভাবে এ-ভাবটা আরও গেল বেড়ে। দিনের কর্মচঞ্চলতাও কমে গিয়ে মনটা নিজেকে নিয়ে

আরও বেশি করে পড়েছে, তারপর একসময় সেটা যখন প্রায় চরমে সেই সময় রামরত্তনের সঙ্গে দেখা হোল।

বেশ গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান, বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে, গায়ের রং ঘোর কালো; মাথায় বাবরি করে ছাঁটা চুল, তার ওপর একটা টকটকে রাঙা গামছা জড়ানো; কোমরের কাপড় ঘিরেও একটা ঐ রঙের গামছা; মোটা গোঁফ, শেষের দিকটায় পাক দিয়ে উঁচু করে তোলা, চোখ হুটো বড় বড় এবং জ্বলন্ত। রামরত্তন হাসপাতালের একজন সর্দার, দিনের সর্দার বদলি হয়ে তার জায়গায় ডিউটি করতে এসেছে। ডিউটি অর্থে ধোওয়া, মোছা, ঝাঁট দেওয়া, পরিচ্ছন্ন রাখা।

দিনে যে-লোকটা ছিল, সে যেন একটু এলাকাড়ি দিত, কিংবা এও হতে পারে, দিনে কাজ বেশি বলে তাকে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যেত না। রামরত্তন বরং একটু গা-ঘেঁষা গোছের, আমার সুখসুবিধার দিকে ভালোরকম লক্ষ্য তো রাখলই, তা ভিন্ন পাশে দাঁড়িয়ে খানিকটা পরিচয়ও নিল,—কোথায় থাকি, কি করি, কোথায় যাব, অসুখটা কি করে হোল ইত্যাদি। বড় ভালো লাগল, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা মনে হবে, এতক্ষণ পর্যন্ত বড়, মাঝারি, ছোট ডাক্তার তদুপরি নার্সরা অত করে যে-সাহসটা সঞ্চারিত করতে পারেননি মনে, রামরত্তন অতি সহজেই যেন এনে ফেলল সেটা।

তার কারণটুকু পরে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করছি। প্রথমত হোল ওর চেহারাটাই। প্রাণটা তখন আমার এপার-ওপারের মধ্যে দোল খাচ্ছে; মনে হোল যদি ওপারের দিকেই চলতে হয় তো এমন একটি লোকের সাহচর্য পাওয়া গেল যার সেই ওপারের সঙ্গীদের সঙ্গে বেশ একটি সাদৃশ্য আছে। এটা হবে কতকটা যেন প্রক্সির সঙ্গে রিহার্সেল দিয়ে মূল নাটকের জন্যে তৈয়ের হাওয়া গোছের।

দ্বিতীয় কারণ যা আমায় আরও বেশি করে সাহস এনে দিল তা রামরত্তনের দৃষ্টির স্বচ্ছতা। টের পেলাম রামরত্তন হুনিয়াটাকে মুদ্দ-

ফরাশের পরিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। আপনাদের খটকা লাগবারই কথা, কিন্তু ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হবে।

সাধারণভাবে একথাটা বেশ বলা চলে যে আমাদের দৃষ্টি হয় তীব্র আসক্তির হেতু এপারেই থাকে নিবদ্ধ, না হয়, যদি কোন কারণে বৈরাগ্য এসে পড়ল তো একেবারেই ওপারে। মুদ্দফরাশ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। তারা এপার-ওপারের মাঝখানে এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে যে তাদের দৃষ্টি একসময়েই দুই দিকে নিবদ্ধ থাকবার সুযোগ পায়, ফলে, দুই পার মিলিয়ে যে পূর্ণ, সামগ্রিক জীবন সেটা সম্বন্ধে একটি সহজ তত্ত্বজ্ঞান তাদের আয়ত্তে এসে পড়ে। রামরত্তন যে শুধু আমার পরিচয়াদি নিয়েই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল তা নয়, অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ কথাও বলে আমায় চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। অবশ্য যখন নার্স বা অন্য কেউ কাছে নেই—

বলল—"বড়াবাবু, জিন্দ্‌গীটা কুছু না আছে। এই দেখুন সন্‌সারকে পিঁজরামে এতোদিন বন্ধা ছিলেন, তারপর আচানক্ তো সেই পিঁজরা থেকে উড়েই যাওয়ার দাখিল এখোন। নহি, কুছভি না আছে এ সন্‌সার বড়াবাবু। অওর ভি খেয়াল করুন। মনুষ্য্ যেখানে যাবে বলে মতলব কোরে জনম্ ল্যায়, যেতোদিন থাকব বলে, তা কি পারে সোব সময়? এই দেখুন না, আপনি ঘোর ছেড়ে কলকাত্তা যাবেন বোলে নিক্‌লেছিলেন, এসে পড়লেন অস্‌পাতাল; এর পোর সিধা কলকাতা যাবেন কি উই উদিকে (আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে) অওর কোই জগহ্, তার কুছ ঠিক আছে?"

না, অন্য ভাবেও সাহস আনবার চেষ্টা করল রামরত্তন—ভালো হয়ে যাবো—হনুমানজী আছেন—জানকী মাঈকে কোন্ "গড্ডা" থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন রামচন্দ্রজীর কাছে—তাঁর নজর দুনিয়ার চারিদিকেই—এমন বেঘোরে কি মারা যেতে দিতে পারেন আমায়?

আরও সব এই ধরনের কথা। চোখের দৃষ্টিতে সে-সবের আন্তরিকতায়ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তবু কণ্ঠে এমন একটি

নির্লিপ্ত সুর ঢেলে বলা যে যদি কোন কারণে হনুমানজীর নজর আমা থেকে একটু এদিক-ওদিক গিয়ে প'ড়ে অন্য কিছু হয়েই যায় তো তাতে রামরত্তনও বিস্মিত হবে না, এবং আমারও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুদিক বজায় রেখে স্বচ্ছ দৃষ্টির কথা বলেছি। এই সব তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে এপারের দিকেও নজরটা বেশ সুস্থ রামরত্তনের। অবশ্য যে রয়েছে এপারে, বা কিছুদিন থাকবার আশা রাখে তার সম্বন্ধে; এক্ষেত্রে ওর নিজেরই সম্বন্ধে। কথাবার্তায় ইঙ্গিত দিল হাসপাতালে তেমন কোন আমীর অর্থাৎ অবস্থাপন্ন লোক এসে পড়লে ওরা কিছু আশা রাখে। বকশিশ তো আছেই, তা ভিন্ন যাঁরা আর ফেরেন না তাঁদের কাপড়টা জামাটা জুতো জোড়াটা এখানেই তাদের দিয়ে যান যারা জীজান্ দিয়ে তাঁদের সেবা করে।...সেবার জন্যে রামরত্তনেরই হাসপাতালে নাম বেশি—সে আমি দেখতেও পাব।...অবিশ্যি, হনুমানজী না করুন, যদি নিতান্ত মাথা ফাটিয়ে যাওটাই আমার নসিবে লেখা থাকে। নৈলে, রামঃ! হনুমানজী করুন যেমন ঘর থেকে সব জিনিস বেরিয়েছিল তেমনি ঘরে ফিরে যাক, একরত্তিও কিছু লোকসান না হোক বড়াবাবুর।

এও এমন অপূর্ব একটি নির্লোভ এবং নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলা যে এতটুকু কোথাও আঘাত লাগে না মনে। এওতো সৃষ্টির একটা পরম সত্য। একজন হারাবে তবে তো একজন পাবে; অন্যথা সে তো অপচয়ই, অপূর্ণতাই। মনে পড়ে গেল মেরিয়া-ই-রিমার্কের 'অল কোয়াএট্ অন্ দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট্' বইখানার একটা জায়গা। চরিত্রটার নাম ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় হিমেল্স্টস্। হাসপাতালে পাশের বিছানায় সাথী মরতে বসেছে, তার ভালো জুতোজোড়াটার দিকে লোভ।...কিন্তু সে লোভও এত সহজ, যেন মনে হয় লুব্ধতার অল্পই আছে তার মধ্যে। অর্থাৎ ঐ পরম সত্য। অপচয় কেন? জুতো জোড়াটা খালি পড়ে থাকাব চেয়ে অন্য দুখানি পা তাকে পূর্ণ করে রাখে সেই ঠিক নয় কি?

পরদিনই প্রায় একভাবেই চলল, গতিটা কোন্‌দিকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রে ডিউটি বদলাবার পর রামরত্তন এসে আগের রাত্রের মতো কিছু তত্ত্ব কথা শোনাবার পর বলল—"বড়াবাবু একটা এত্তালা আছে।" বললাম—"বলো।"

"যাঁরা সোব আপনার মোতন বেহাল্‌ হোয়ে এসে পোড়েন, তাঁদের ভালাই কোরবার জন্যে আমাদের একটা গোতিয়া আছে, এই আপনারা যাকে বোলেন সভা ইয়া সন্‌স্থা। যাতে তাঁদের তন্‌-মন্‌-আৎমার (তনু-মন-আত্মার) কল্যাণ হোয় সেই রোকোম ক্রিয়া-করম্‌ করে থাকি। বড়াবাবুর হুকুম হোয় তো ইন্তেজাম করি আমরা।"

মনে করলাম মন্দ কি? মানুষ তো আঁকড়েই ধরতে চায় জীবনটাকে শেষ পর্যন্ত। তা ভিন্ন অবস্থায় পড়ে যখন বসুধৈব কুটুম্বকম্‌, তখন কেউ একজন যে শুভকামনা করছে এ চিন্তার মধ্যেও একটা সান্ত্বনা থাকে। নিশ্চয় স্বস্ত্যয়ন-জাতীয় কিছু অনুষ্ঠান, পুরুত ডাকিয়ে করবে কি নিজেরাই করবে সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়, এই সাম্যবাদের যুগে উচিতও মনে করলাম না সে প্রশ্ন করা। বললাম, —"সে তো ভালো কথাই রামরত্তন, করো না ব্যবস্থা।"

একটু আগ্রহের দৃষ্টিতেই চেয়েছিল রামরত্তন, সুপুষ্ট গোঁফের নীচে একটু হাসি ফুটল। একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলল—"কুছ্‌ খরচ হোবে বড়াবাবু। সন্‌স্থার আমরা সোব গরীব হরিজন আছি তো।"

বললাম—"না, তোমরা কেন খরচ করবে রামরত্তন?—এক পয়সাও করবে না।...কতো লাগবে আন্দাজ করো?"

"আমরা ইস্‌মিট্‌ (এস্টিমেট্‌) করেছি বড়াবাবু। সোব রোকোম হোয়, আপনি আমীর আর বড়া আদমি আছেন, আপনার জন্যে সাত-আঠটো রুপেয়া লাগবে।"

আমি বালিসের নীচে থেকে পার্সটা বের করে নিয়ে একটি দশটাকার নোট বের করে রামরত্তনের হাতে দিয়ে বললাম—"এইটে রাখো রামরত্তন। যা লাগে লাগবে, বাকিটা তোমাদের সংস্থার।"

টেলিগ্রাম পেয়ে পরদিন সকালেই আমার তুজন আত্মীয় এসে উপস্থিত হলেন এবং বেলা একটা পর্যন্ত আমায় বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলা হোল, মোটর এ্যাম্বুলেন্স্ করে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অল্প একটু এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের কলকব্জায় কোথায় কি একটু হয়েছে, ড্রাইভার বনেটটা তুলে পরীক্ষায় লেগে গেল। এদিকেও সময় পেয়ে ঠিক হোল তাহলে পথের জন্য গোটা তুই ডাব কিনে নিলে ভালো হয়। এঁরা তুজনে নেমে পড়লেন। অল্প একটু দূরে মোড়ের মাথায় একটা পানের দোকান, ডাবও সেইখানেই পাওয়া যাবে, ওঁরা চলে গেলেন।

আমাদের গাড়িটি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তার ডান দিকে একটি ছোট বস্তি। শুয়ে আছি, একটু পরে দেখি রামরত্তন হঠাৎ এ্যাম্বুলেন্সের পেছনে খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হ'ল রাত্তিরে ডিউটির জন্য বোধহয় ঘুমাচ্ছিল, এ্যাম্বুলেন্স দেখে বস্তি থেকে একটি ছেলেমেয়ের দল যে হৈ হৈ করে ছুটে এসেছে তাইতেই ঘুমটি গেছে ভেঙে। একটু যেন বিস্মিত, যাতে মনে হোল আমার চলে যাওয়ারও কথাটি ওর জানা ছিল না। আর··কী বলা যায়?— একটু যেন নিরাশও, এবং সেই জন্যই বোধহয় একটু অপ্রাস্তিভও। বললাম—"বাঃ, ভালই হোল তোমার সঙ্গে দেখা হোল রামরত্তন, আমার আত্মীয়েরাও এসেছেন, আমায় নিয়ে যাচ্ছেন। তুমি আমার জন্য যথেষ্ট করেছ, ভালোই হোল যাওয়ার সময় দেখাটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, ঠিক কথা, তোমাদের বকশিশ আমি এখনকার সর্দারের কাছে দিয়ে এসেছি, নিয়ে নেবে। সত্যি খুব সেবাযত্ন করেছ···

একটু যেন সাড় ফিরে এলো রামরত্তনের; সেই বিস্মিত ভাব থেকে, গোঁফের নীচে একটি হাসি ফুটে উঠলো, সেই মনের আলো টেনে আনা হাসি। বলল—"বড়া খুশী হোল বড়াবাবু, আপনি যাচ্ছেন। লেকিন আমাদের সনুস্থা সবকুছ্ তৈয়ার রেখেছিল,

আপনার কুছুভি কষ্টো হোত না, না বিশোয়াস হোয় আপনি আপনা আঁখসে দেখুন, ঐ মজুত রয়েছে।"

একটু সরে দাঁড়িয়ে সামনেই বস্তির একটা ঘরের বারান্দার দিকে আমার দৃষ্টি চালিত করল।

একটি খাটুলি। প্রায় সমস্তটুকুই রাঙা সালু দিয়ে মোড়া। চারটি পায়ার সঙ্গে চারটি ঐ রকম সালুই-জড়ানো বাঁশের বাতা, তার মাথায় চারটি পতাকা। এই চারটে বাতার সঙ্গে আবার চারটে অপেক্ষাকৃত সরু বাতা ধনুকের মতো করে আড়াআড়িভাবে বাঁধা, সালু-জড়ানোই। অর্থাৎ যথাসাধ্য মনোহর করে সাজানো একটি শবাধার যাতে করে তেমনি কোন বিশিষ্ট লোক মারা গেলে পশ্চিমারা শ্মশানে নিয়ে যায়।

একটু গর্বের সহিতই ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—"ইর সঙ্গে কীর্তনকাভি বন্দোবস্ত্ ছিল বড়াবাবু। ফিন্ তার সঙ্গে পৈশা, কউড়ি, এক-অন্নি, ফুল, লাবাভি (খৈ) ছিটুবার বন্দোবস্ত্ ছিল। ই খাটিয়া থেকে নেবে আপনি সিধা বিষ্ণুজীর রোথে গিয়ে উঠতেন—জী হাঁ!" অর্থাৎ এই খাটুলি থেকে নেবে আপনি সোজা বিষ্ণুরথে গিয়ে উঠতেন।

ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার দেখে নিয়ে বললাম—"বড় লোভ হচ্ছে রামরত্তন, কিন্তু কপাল থাকা চাই তো। আবার যদি কখনও···"

রামরত্তন মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিভ কেটে বলল—"উ কথাটি বলবেন না বড়াবাবু, হনুমানজী আপনাকে আরাম করে দেবেন—উ কথাটি বলবেন না···"

ওদিকে ঠিক হয়ে গেছে, ওঁরাও দুজনে এসে গেছেন, মোটর স্টার্ট দিল। যতক্ষণ পারা গেল চোখোচোখিই হয়ে রইলাম রামরত্তনের সঙ্গে। আশীর্বাদের মতো সেই প্রাণের আলো টেনে আনা মিষ্টি হাসিটি লেগে রয়েছে মুখে, সেটাকে আরও যেন ফুটিয়ে তুলেছে ওটুকু কি?—নৈরাশ্য?

"ক্লাইম্যাক্স"

আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা থেকে গল্পটা ফেঁদেছি, উদ্দেশ্য, গল্পের ক্লাইম্যাক্স্ জিনিসটা কি তাই বোঝানো। শ্রোত্রী বা শিষ্যা আমার স্ত্রী এবং তাঁর চতুর্দশবর্ষীয়া ভগ্নী মীরা। প্রথমে সংজ্ঞাটা সম্বন্ধেই ধারণাটুকু পরিষ্কার করে দিলাম ; বললাম ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে কোন রচনা বা রচনাংশের চরম পরিণতি—সে রচনা গল্প, উপন্যাস, কাব্য, মহাকাব্য, যাই হোক। কোন একটা বিশিষ্ট বা ব্যাপক অনুভূতিকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে চূড়ান্ত পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হ'ল ক্লাইম্যাক্স্। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে যেমন সমগ্র বইখানার শেষাংশ তার ক্লাইম্যাক্স হতে পারে, তেমনি তার একটা অধ্যায় বা আরও খণ্ডিত অংশেও একটি বিশেষ অনুভূতি বা পরিস্থিতির ক্লাইম্যাক্স সৃষ্ট হতে পারে। এই ক্লাইম্যাক্সটিকে ঠিক-মত ফুটিয়ে তোলাতেই রচনা বা রচনাংশের সার্থকতা। ক্লাইম্যাক্স জিনিসটা খুব পরিষ্কার রূপ নিয়ে ওঠে তীব্র অনুভূতি নিয়ে কোন রচনার মধ্যেই। তাতে পাঠক বা শ্রোতা তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যে এমন আত্মবিস্মিত হয়ে যেতে পারে যে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসতে পারে ; কী বলছি, কী করছি কোথায় আছি সে বিষয়ে কোন সম্বিৎই থাকে না। এমনকি পরিণতিটা যতই খারাপ হোক, হঠাৎ উল্টে গেলে আশাভঙ্গের ধাক্কাও লাগে বুকে। মীরার দিকে চেয়ে বললাম—"এই সবের জন্যেই তোমার দিদি বই হাতে করে রান্নাঘরে ঢুকলে শুক্ত হয়ে যায় টক, অম্বল হয়ে যায় তেতো, দুধ হয়ে যায় নোন্তা, ডাল হয়ে যায়…"

স্ত্রী বললেন, "গল্পটা বলবে তো বসি, ব্যাখ্যানা করতে হয় তো শুধু ওর কাছেই করো।"

"না, বসো"।—বলে আরম্ভ করে দিলাম।

"একবার দিন সাতেকের জন্য আমি আমার বন্ধু বিকাশের ওখানে বেড়াতে যাই। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনের কথা, বিকাশ একটা বিশেষ দরকারে সকালেই বাইরে বেরিয়ে গেল, ফিরবে খানিকটা রাত করেই। সমস্ত দিনটা বই পড়ে আর এদিকওদিক করে কাটিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে মনে হল খানিকটা বাইরে ফাঁকা থেকে না হয় বেড়িয়ে আসি, বিকাশ এলেই তো আবার শহর দেখা, রাজবাড়ি দেখা, পার্টি, ক্লাব এই সব আরম্ভ হবে। ট্রেনে আসবার সময় শহর থেকে আন্দাজ মাইল তুয়েক দূরে একটি জায়গা বড় ভাল লেগেছিল ; একটি বেশ-চওড়া নদী—তা কলকাতার গঙ্গার প্রায় আধাআধি হবে সব নিয়ে—ওপরে একটা ন্যাড়া-পুল, তার ওপর দিয়েই গাড়িটা এল, দূরে দূরে পাহাড় ; কাছেও পাহাড় না হোক এখানে ওখানে কিছু টিলা ছাড়ানো, কয়েকটা বেশ খানিকটা উঠেও গেছে। আমাদের গাড়িটা পাস্ করল ঠিক সূর্যাস্তের মুখে। পাহাড়ে নদী, মাঝখানে শুধু কয়েকটা জলের রেখা ছড়ানো রয়েছে, বাকি সমস্তটায় ধুধু করছে বালি। সেই গেরুয়ারঙের বালির ওপর অস্তমান সূর্যের রাঙা রশ্মি পড়েছে ছড়িয়ে, গাংচিলের ছোটবড় ঝাঁক বাসায় ফিরছে, জলের ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচার গায়ে সোনালী রোদটা ঝিকঝিক করে উঠছে—সমস্তটুকু মনে গেঁথে গিয়েছিল!

আমি অবশ্য ঠিক সে জিনিসটা আর দেখতে পাব না। কেননা বাড়ি থেকে বেরুতেই সূর্যাস্ত হয়ে যাচ্ছে, পৌঁছুব ক্রোশ খানেক পথ হেঁটে। তবে শুক্ল পক্ষের মাঝামাঝি যাচ্ছে, একটা অন্যরূপে দেখতে পাব, সে বোধ হয় আরও ভালই হবে।

"রেলের লাইন ধরে একটু পা চালিয়েই গেলাম। যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য একেবারে ডুবে গেছে, শুধু আকাশে এদিক-ওদিক ছড়ানো যে মেঘের টুকরাগুলো রয়েছে তাতে একটু একটু রঙের পোঁচ লেগে রয়েছে ; কোনটাতে হাল্কা, কোনটাতে একটু গাঢ়। আকাশের মাঝখানে চাঁদটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। আমি পুলটা পেরিয়ে একেবারে ওপারে

চলে গিয়ে লাইন থেকে নেমে পাশেই একটি ছোট্ট টিলার ওপর গিয়ে বসলাম। বসলাম পশ্চিমমুখো হয়ে, সামনে হাত পাঁচেক পরেই নদীর তীরটা গেছে নেমে।

"দেখলাম, আগে বেরুবার কথা যে মনে পড়েনি, খুব ভালই হয়েছে। এমন একটি পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে আমি বহু দিনই পাইনি নিজেকে, এর আগে কখনও পেয়েছি বলেই মনে পড়ছে না। চঞ্চল জীবনের সব শব্দই গেছে থেমে, শুধু অনেক দূরে নদীটা একটা বাঁকের পর যেখানে জ্যোৎস্নার মধ্যে মিলিয়ে গেছে, খুব ক্ষীণ একটা পাখীর ডাক, খুব সম্ভবতঃ চখা-চখী, ওরা শুনেছি দূরে আলাদা আলাদা থেকে এইরকম করে ডাকতে থাকে পরস্পরকে। বোধ হয় ভাবে এতে দাম্পত্য কলহের সম্ভাবনাটা একেবারে দূর না হোক, কমে আসে।"

মীরার বোন একটু তীর্যক দৃষ্টিতে চাইলেন। কিছু বলতেনও বোধ হয় আমি তার আগেই শুরু করে দিলাম—"একেবারে কাছে জীবন্ত কোন শব্দই নেই, শুধু একটা টানা হাওয়া, আর সেটাকে আমার কেমন করে যেন মনে হচ্ছিল, এই যে মুমূর্ষু দিনটি পৃথিবীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে, এ তারই যেন দীর্ঘশ্বাস! এরকম অবস্থায় মনটা আপনিই কি করে এক হয়ে যায় এইরকম পরিস্থিতির সঙ্গে। আমার বয়সও তো প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি; আমারও জীবনের সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এইবার বিদায়ের পালা—এই মনে করে চোখের পাতা ভিজে ভিজে হয়ে আসছে—একটা দীর্ঘশ্বাসও ঠেলে আসছে বুকে, এমন সময়..."

"মীরা, জিজ্ঞেস কর্ বাজে কথাই চলবে? তাহলে উঠি, আমার কাজ আছে ঢের। সাহিত্যিক নই।"

মীরার বোনই। এবার অন্যরকম ভাব, বেশ কিছু গুরুতরই মনে হল। আমি স্বভাবদোষে পড়ে গিয়েছিলামই একটু ঘোরে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে আবার শুরু করে দিলাম,—"দীর্ঘশ্বাসটা চেপে আসছে বুকে, এমন সময় যেন হুঁশ ফিরে এল—সামলে নিয়ে নিজের মনেই বললাম—

বা-রে। এরকম যদি বাজে কাব্যিতে পেয়ে বসে এখানে তাহলে তো সমস্ত রাত বসেই থাকতে হবে। তখন বেশ কিছুক্ষণ কেটেও গেছে সেখানে, ফিরতে অনেকটা পথও, তার ওপর নতুন জায়গা, ভাবলাম এইবার উঠে পড়া যাক। কিন্তু ভাবুকতাটুকু মন থেকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিলেও, জায়গাটার নিজের একটা মোহ আছেই, মনে হল আর একটু বসে যাই, এ সুযোগ তো জীবনে বেশি আসে না। এই রকম ওঠবার কথা মনে হতেই আর একটু বসে যাই বসে যাই করে অনেক বারই হয়ে গেল। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। কোন আত্মীয়-কুটুমের বাড়ি গেলে—যেমন ধর, যখন তোমাদের বাড়ি যাই, ভালো না লাগলেও একবার এর কথায়, একবার ওর কথায় আটকে আটকে যেতে হয়। এখানে জায়গাটাই টেনে টেনে রাখছে। বেশ খানিকটা এইভাবে কাটবার পর হঠাৎ এক সময় যেন আমার চমক ভাঙল, যেন কোথায় বা কিসের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম—হয়তো বা নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও, এই আবার ভেসে উঠেছি। ভেসেও যে উঠলাম তাও একটা নূতন পরিস্থিতির মধ্যে। সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ, সেই যে হাওয়ার শনশনানিটুকু ছিল তাও আর নেই। তোমরা আবার চটে যাবে, নইলে বলা যেত হঠাৎ যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই দিনটার মৃত্যু ঘটে গেছে কখন। আমার নিজের অনুভূতিটাও গেছে বদলে একেবারে। সেই মুগ্ধ আনন্দের ভাবটা গিয়ে গভীর রাতে এই রকম খোলা নির্জন জায়গার নিটোল নিস্তব্ধতা আমায় সম্পূর্ণ অন্যভাবে অভিভূত করে ফেলছে আস্তে আস্তে। গাটা ছমছম করে আসছে, একটা অহেতুক ছেলেমানুষী ভয় বুকটাকে চেপে যেন সত্যিই শ্বাসরুদ্ধ করে আনতে লাগল। শনশনানি-টুকু গেলেও হাওয়া একটু রয়েছেই, এত খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, আমার মন শুধু যেন বলতে লাগল—'একটু শব্দ দাও, পৃথিবীর এতটুকু শব্দও শোনাও আমায় কেউ'।

ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা শব্দ উঠলও আকাশ-বাতাস চকিত

করে। শব্দের সেরা শব্দই—রাম-নাম; কিন্তু বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। পেছন ফিরে দেখি লাইনের পাশ দিয়েই, প্রায় শ'খানেক গজ দূরে কতকগুলো লোকের একটা ছোট দল চালি করে একটা শব নিয়ে আসছে। জান বোধ হয় এই রকম উপলক্ষে পশ্চিমারা 'রাম নাম সত্য হ্যায়' বলে পথ চলতে থাকে। ওরা ঐখানেই লাইনের বাঁধ থেকে নেমে গেল। আমি তা হলে একটা শ্মশানের কাছেই বসে আছি।

"সেই ভয়টা যেন বেড়ে গেল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সাহসও খানিকটা এল ফিরে। হোক শ্মশান, কিন্তু কাছাকাছি অনেকগুলি লোকের সঙ্গে তো পাওয়া গেল। একটু বসেও রইলাম, তারপর ফিরব, দাঁড়িয়েও উঠেছি, ওদের মধ্যে একটা যেন কি নিয়ে একটু চঞ্চল আলোচনা উঠল। শ্মশাটা খানিকটা দূরেই, কিন্তু ঐ রকম ফাঁকা জায়গায় আওয়াজটা স্পষ্ট হয়েই ভেসে আসে। একটু কান পেতে থাকতেই বুঝতে পারলাম, শবদেহটা তীরের কোল থেকে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে এসে দাহ করবার কথা হচ্ছে, কারণটাও টের পেলাম—নদীতে ঢল নেমেছে।

"পাহাড়ী নদীতে এই রকমই হয়। এদিকে কিছুই নেই, দূরে পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টি নেমে হঠাৎ প্রবল তোড়ে তুকূল চেপে জল নেমে আসে। তার সঙ্গে ছোট বড় গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, অসাবধান্ থাকলে মানুষও। কোটালের বানের চেয়েও নাকি ভয়ানক। কখনও দেখিনি, ঠিক করলাম দেখে যেতে হবে।

"শোঁ শোঁ একটা শব্দ উঠেছে দূরে।

"একটু দোমনা হয়ে গেছি, এপারে বসেই দেখে নোব, না, ওপারে গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে দেখব? ঠিক করলাম, পেরিয়েই যাই, নীচে স্রোত থাকলে একটু নার্ভাস করে দিতে পারে। পা বাড়ালাম। কিন্তু এই সময় সেই শব্দটা হঠাৎ বেড়ে গেল। আবার বসে পড়লাম আমি, ভাবলাম, তোড়টা ঠিক এসে পড়ার মুখে পুল পেরুনো আরও খারাপ হবে।

"এইখানে মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেল। ঠিক যে জেনেশুনে ভুল তা নয়, হিসেব বা আন্দাজ করতে ভুল। জলের তোড়টা সেই অনেক দূরের বাঁকটা ঘুরতে শব্দটা হঠাৎ বেড়ে উঠেছিল, এসে, পৌঁছুতে যে সময়টা নিল, দেখলাম তাতে আমি স্বচ্ছন্দে পুলটা পার হয়ে যেতে পারতাম। এ যা প্রলয়কাণ্ড দেখছি, ঐ দশটা কামানের গর্জন কানে নিয়ে, আর ঐ তোড়ের ওপর দৃষ্টি রেখে—রাখতেই তো হবে—এখন পেরুই কি করে?…অনেক ওপরে আমি, দেখছি এপার-ওপার নিয়ে বোধ হয় পাঁচ-ছ ফুট উঁচু একটা ফণা তুলে নেমে এল স্রোতটা,—কি গর্জন! ছোট বড় গাছপালা বুকে চেপে কী আপসানি! কী সে ওলটপালট খাওয়া! দেখতে দেখতে পুলের থামগুলোয় ধাক্কা খেয়ে যেন আরও ক্ষেপে উঠে হুঙ্কার দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। তারপর দেখতে দেখতেই নদীর জল এক ফুট দু'ফুট করে বাড়তে বাড়তে তীরেব কাছাকাছি পর্যন্ত উঠে এল।

"দেখা হল একটা জিনিস জীবনে, পঞ্চানন রুদ্রের ভ্রূকুটি-কুটিল আননটা কিছুক্ষণ পর্যন্ত যেন কোন চিন্তা করবার ক্ষমতাই হারিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হ'ল। সেই তখনকার মতই গেছি তলিয়ে—তখন ছিলাম সৌন্দর্যের মধ্যে, এখন যেন প্রলয়ের বিভীষিকায়। তখনকার মতনই এক সময় ভেসেও উঠলাম সেই অতল থেকে; চিন্তা হ'ল—পেরুই কি করে?

"একেবারে গোড়াতেই যেমনটা ছিল,শুকনো নদীর ওপর হঠাৎ যেন সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়া, এখন ঠিক ততটা না হলেও খুবই ভীষণ তো। ন্যাড়া পুলের এক ফুট অন্তর পাতা কাঠের স্লিপারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে পেরুনো, একটু যদি মাথা ঘুরে পা টসে গেল তা হ'লেই আর দেখতে হবে না। শুনেছি এসব স্রোত যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎ চলে যায় কিন্তু সে হঠাতের তো কোন আন্দাজ নেই; জলের পরিমাণ যেমন দেখছি, পাহাড়ে বৃষ্টি থেমে গিয়ে থাকলেও এজল বেরিয়ে যেতে অন্তত সমস্ত রাত কেটে যাবে। বৃষ্টি হতে থাকলে তো কথাই নেই।

“কি করব ভাবতে ভাবতেই রাত অনেকটা এগিয়ে গেল। ঘড়িটা নিয়ে যাইনি, কিন্তু আকাশে চাঁদ যেমন ঢলে পড়েছে নীচে, প্রায় বোধ হয় দশটা হয়ে এল।

“ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটা কথা মনে হল; একজন সঙ্গী পাওয়া গেলে বোধ হয় সুবিধে হত, যদি নেমে গিয়ে ওদের বলি, একজন কাউকে দেয়—শুধু পুলটা পেরিয়ে দিয়ে আসতে…

“আমার চিন্তাটাই যেন রূপ নিয়ে আমার পাশে এসে পৌঁছুল; দেখি আমার পেছন দিয়ে কখন একটি লোক এসে রেলের বাঁধের ওপর উঠতে যাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি, আমি গিয়েছিলাম পুজোর ছুটিতে, পূজো শেষ করে, বেশ একটু ঠাণ্ডার ভাব এসে গেছে তখন। লোকটার গায়ে আগাগোড়া একটা সাদা চাদর জড়ানো, মাথার ওপর দিয়েও ঘুরিয়ে আনা, এদিকে বেশ সবল বলে মনে হল। একেবারে তালের মাথায় পেয়ে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, ওই যেন এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, হঠাৎ দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, ‘বাবু, আপনি অসময়ে এখানে বসে যে!’

“হিন্দীতেই করল জিজ্ঞেস। বললাম, ‘ছাখো না, বেড়াতে এসেছিলাম, আচমকা নদীতে এই বান ডেকে এসে…’

“পেরুতে ভয় হচ্ছে?”—একটু অদ্ভুত ভাবে হাসল লোকটা, মনে হল তাতে যেমন ভরসা দেওয়ার চেষ্টা আছে, তেমনি একটু যেন ব্যঙ্গও রয়েছে মেশানো, বলল—‘অমন হয় পেরুতে ভয়, ভয়ঙ্কর নদীই তো। কিন্তু আসলে ভয়ের কিছুই নেই। এই তো আমিই যাচ্ছি, আসুন না; আসবেন?…আসুন তাহলে, আমার আবার সময় নেই।’

“বলতে বলতেই পা বাড়িয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি নেমে এসে সঙ্গ নিলাম; ও আগে আগে, আমি ঠিক পেছনে। পুলের ওপর উঠে যেতে যেতে একটু কথাও হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি ঐ ওদের দলের লোক?…যেন ওদিক থেকে উঠে এলে মনে হল’।

‘বললে, ‘হ্যাঁ’

'কোথা থেকে আসছ তোমরা ?'

"'কি একটা নাম বললে মনে নেই। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, লোকটার বেশ সহজ সিধা চাল দেখেই হোক, বা যে জন্যেই হোক, আমিও বেশ স্বচ্ছন্দেই স্লিপারের ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছি ভয়ের ভাবটা একেবারেই নেই! সেই কথাই বললাম ওকে। বললাম 'একজন সঙ্গী পেলে সত্যিই বড় সুবিধে হয়। তোমার আবার দেখছি পা খুব শক্ত, একটুও এদিক ওদিক হচ্ছে না'।

'আমার যে অব্যেস হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক বলেছেন যে একজন সঙ্গী পেলে ভালই হয়। নৈলে এ অবস্থায় বড্ড যেন একলা একলা আর অসহায় বোধ হয়, না ?'

"বললাম, 'সত্যি তাই, খুব পেয়ে গেলাম তোমায়, কপালের জোর বলতে হবে আমার।'

"আবার ঘুরে চেয়ে সেই রকম হেসে বলল—'কপালের জোর কি আমারই নয় ? কেমন পথের মাঝেই পেয়ে গেলাম আপনাকে।··· যেন আমার জন্যে বসেছিলেন, নয় কি ?'

"আমিও হেসেই বললাম, 'তা ভিন্ন আর কি ? কিন্তু হ্যাঁ, ঠিক কথা, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তা তুমি সবাইকে ছেড়ে হঠাৎ এমন একলা যে নদী পেরুতে যাচ্ছ ? যাচ্ছই বা কোথায় ?'

"এবার আর কথায় নয়। এ প্রশ্নের উত্তরটা একেবারে অন্যভাবে পাওয়া গেল; দেখি কেউ নেই আর আমার সামনে! জায়গাটা একেবারে ফাঁকা!

"ঠিক পরের মুহূর্তটা আমার কি হয়েছিল মনে নেই। খোলা ঠাণ্ডা হাওয়া থাকার জন্যে বা যে কারণেই হোক সম্বিৎটা ফিরে আসতে নিশ্চয় দেরি হয় নি। দেখি পুলের মাঝখানে একটি কাঠের স্লিপার প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি। বিপদটা খুব উগ্র গোছের হওয়ার জন্যেই বোধ হয় জ্ঞানটা বেশ তাড়াতাড়ি আর স্পষ্ট হয়েই ফিরে এল। লোকটার—আর লোক বলিই বা কি করে ?—ওর প্রত্যেকটি কথা

তার আসল অর্থে ফুটে ফুটে উঠল আমার কাছে—বুঝতে বাকি রইল না, কী দুকুল-হারা নদী পার হয়ে ওর কাছে এ নদী যেন গোষ্পদমাত্র এখন! সত্যিই কত যে অসহায় ও, কী যে একা!

"এই 'একা' কথাটা হঠাৎ আমার কাছে যেন অতিরিক্ত বিভীষিকা-ময় হয়ে উঠে ভয়ের তোড়ের ওপর আর একটা তোড় এনে ফেলল—একা, তাই কি অনন্তপথের যাত্রী এই বিদেহী আত্মা আমায় তার সঙ্গী করে নিতে এসেছিল? নিজের প্রশ্নটাতেই ভয়ে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা উৎকট হুঙ্কার শুনে সামনে চাইতেই দেখি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিযে সাক্ষাৎ মৃত্যু ছুটে আসছে সামনে। এক মুহূর্তের বিভ্রম, তার পরেই ব্যাপারটা বুঝলাম, সামনের উঁচু টিলাটা ঘুরে একটা ট্রেন মত্ত গতিতে আসছে ছুটে, তার ইঞ্জিনের সার্চলাইট এসে পড়েছে আমার ওপর, দেখেছে ড্রাইভার, প্রাণপণে হুইসিল দিতে দিতে সতর্ক করতে করতে ছুটে আসছে—কিন্তু ফল কি আর সতর্কতার? মৃত্যু আমাব দু দিকেই—সামনে ঐ, নাচে এই বিক্ষুব্ধ প্রলয়-পয়োধি।

"তবু নীচে ঝাঁপিয়েই পড়ে লোকে এ অবস্থায়, কিন্তু শরীরের সমস্ত স্নায়ু আমার তখন একেবারে শিথিল হয়ে গেছে। ওদিকে আর এইটুকু মনে আছে যে দুটো হাতে চোখ দুটো চেপে ধরে মাথাটা রেলের মাঝখানে দিযেছি শুয়ে।

"তার পরেই মনে পড়েছে একটা যেন বিকট অন্ধকার মূর্তি ঠিক হাত দুয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে বজ্র কঠোর স্বরে হুঙ্কার ছাড়ছে···ইঞ্জিনটা আর কি। ড্রাইভার ব্রেক্···"

"যাঃ! বেঁচে গেলেন!"

মুখ থেকে কথাটা যেন হঠাৎ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল মীরার, তীব্র উৎকণ্ঠায় হাত দুটো মুঠো করে বুকের ওপর চেপে ধরেছিল, আলগা হয়ে গেল।

স্ত্রীও ঠিক ঐ ধরনেরই কিছু বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন, সামলে নিয়ে

ওর পিঠে একটা মৃদু চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, "ত্যুৎ, অমন করে বলে! একেবারে হুঁশ হারিয়ে বসিস্ যে গল্প শুনে!..."

"উঃ! ভাগ্যিস!" বলে আরও খানিকটা সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন একটা কাজের ছুতো ক'রে।

নিশীথের অতিথি

একটা রোঁয়া-ওঠা হাড়-জিরজিরে বুড়ো কুকুর থাবা দুটোর ওপর মুখটা রেখে শুয়ে আছে। পাশেই একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সুধীরবাবু একটা মোটা ইংরাজী বই পড়ছেন। বাঁ-হাতে গড়গড়ার নল।

আমায় দেখে বললেন—"শৈলেন যে, অনেকদিন পরে দেখছি। বোস।"

আমি তখন বাইরে থেকে কলেজে পড়ছি। প্রণাম করে পাশের চেয়ারটায় ব'সে বললাম—"হ্যাঁ মাস্টারমশাই, বোধ হয় বছর দুই পরে এলাম? আছেন কেমন আপনি?"

"কেমন দেখছ? ··ঠিক ক'রেই বলো। খুঁড়ছ—এমন ভয় করবার দরকার নেই। খুঁড়ে এখন পর্যন্ত আমার কেউ কিছু করতে পারে নি।"

—হেসে উঠলেন।

সুধীরবাবু ছিলেন আমাদের বাংলা স্কুলের হেডমাস্টার। ক্ষুদ্র স্কুলের শিক্ষক, কিন্তু অমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ খুব কম দেখেছি জীবনে। কোন একটা বাড়ির কি ব্যক্তিত্ব বলে জিনিস থাকতে পারে? তা যদি সম্ভব হয় তো শুধু যেন তারই সঙ্গে মাস্টার মশাইয়ের ব্যক্তিত্বের তুলনা করা যেতে পারে।

ওঁদের বাড়িটা ছিল শহর থেকে খানিকটা দূরে—নিতান্তই বিচ্ছিন্ন একটা জায়গায়। সামনে দিয়ে জেলা-বোর্ডের প্রশস্ত রাস্তাটা পূব-পশ্চিমে সোজা চলে গেছে। তারই সঙ্গে এক লেভেলে এখানকার বড় বিঘার প্রায় বিঘা তিনেক (বাংলার বিঘা সাতেক) জমি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই জমির একেবারে শেষ প্রান্তে ওঁদের বাড়িটা। পুরানোকালের বাড়ি। মাঝখানে প্রশস্ত উঠান, চারদিকে বড় বড় ঘর। খাপড়া বা খোলার ঘরই। সে সময়

অবস্থাপন্ন লোকেদের মধ্যেও কোঠা তোলবার রেওয়াজ ছিল না এদেশে।

বাড়ি আর রাস্তার মাঝখানের লম্বা-চওড়া খোলা জায়গাটায় যত রকম গাছপালা—আম, কাঁঠাল, কুল, বেল—একটা বিরাট কয়েতবেল, আরও সব। মাঝখানে খানিকটা ফুলের বাগান, তার পাশেই খানিকটা খালি জায়গা, মাঠ থেকে ফসল কেটে এলে গাদা করবার জন্যে, ঝেড়ে-ঝুড়ে তোয়ের করবার জন্যে।

রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত এই উঁচু ভিট-জায়গাটার পরই বাঁয়ে আর পিছনদিকে নিচু ধানক্ষেত, দূর-বিস্তৃত। ডান দিকে একটা বেশ বড় পুষ্করিণী।

শহর থেকে বিচ্ছিন্ন, উঁচু ডাঙার ওপর পুরনো গাছপালার মাঝে এই বাড়িটা ছিল বড় বিশিষ্ট। উন্মুক্ত, একক, আত্মনির্ভর। চারিদিকের শূন্যতার মাঝখানে, নিঃসঙ্গতাজনিত নানারকম বিপদ-আপদের মধ্যে নিজের বলিষ্ঠতা সম্বল করে আছে দাঁড়িয়ে। শহরের মধ্যে কত ঘরবাড়ি, কত অট্টালিকা, প্রমোদ-উদ্যান; কিন্তু মাস্টার-মশায়ের বেলার-বাড়ির নাম করলে সবই আমার কাছে কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে যেত। তার কারণ, ওসব তো ছিলই, তা ছাড়া বাড়িটার কথা মনে হলেই মাস্টারমশায়ের চেহারাটা যেন ওর কেন্দ্রস্থলটিতে আপনি উঠত জেগে—দীর্ঘ-ছন্দ, বলিষ্ঠ, চোখে তেজের সঙ্গে প্রসন্নতা, বুকে সাহসের সঙ্গে দুঃসাহস।

একটা বাড়ির সঙ্গে একজন মানুষের এরকম আশ্চর্য সমন্বয়, এমন ওতঃপ্রোত হয়ে মিলে যাওয়া আর কোথাও পাইনি আমি। মিলে যাওয়া একটা আশ্চর্য বিরাটত্বের মধ্যে।

অথচ কত সাধারণ। বাড়িটাকে মাস্টারমশাই খামারবাড়ি বলতেই ভালবাসতেন। নিজের সম্বন্ধে বলতেন—আমি তো চাষাভুষো মানুষ। অন্তত বেলার বাড়িতে তাঁর এইটাই ছিল রূপ। একেবারে সকাল-বেলায় গেলে দেখা যেত—বাড়ির আখড়াতেই কুস্তি সেরে বসে আছেন,

আখড়ারই কোন ছোকরা-সাকরেদ গায়ে মাটি মাখাচ্ছে। এর পর ছিল বাইরের গৃহস্থালি—পরনে একটা আধময়লা ধুতি, গায়ে গামছা বা একটা তোয়ালে, মাস্টারমশাই খড়িয়ানে (ফসল মাড়াইয়ের উঠান) জন খাটাচ্ছেন, কিংবা বাগানে খুরপি হাতে গাছ নিড়াচ্ছেন, কাটারি-হাতে ছাঁটা-কাটা করছেন। কুড়ুল হাতে কাঠ ফাড়তেও দেখা যেত, কোদাল হাতে জমি কোপাতেও।

এরপর স্কুলে আসতেন। সাধারণ বাঙালীর পোশাক, পরিচ্ছন্নতার কণামাত্র ক্রুটি নেই কোথাও ; শৌখিনতার ধারে কাছে দিয়েও যায় না।···পা দেওয়ার পথ থেকেই স্কুলটা থমথমে হয়ে থাকত। পড়ানর কায়দা ছিল একেবারে নিজস্ব। পাঠ্যপুস্তকের দৈনিক পাঠ সারতে অল্প সময় লাগত। তারপর বাইরের বই বা গল্প নিয়ে পড়তেন। বেশীর ভাগই নেপোলিয়ান বা ঐ ধরনের মহা-পুরুষদের। অ্যাবট্‌স্‌ লাইফ অফ নেপোলিয়ান ছিল তাঁর সব চেয়ে প্রিয় বই। মারতেন কম। নৈতিক কিছু ক্রুটি দেখলে তবেই বেত ধরতেন। আর তখন বলতে গেলে মৃত্যুর দরজার কাছাকাছি পর্যন্ত না পৌঁছে গেলে ছাড়তেন না। অবশ্য ক্রুটি তেমন বেশী হলে। বলতেন—এ ছেলে বাদ পড়াই দরকার সময় থাকতে। (এ হেড-মাস্টারের জাত গেল কোথায় ?)

সেই যে স্কুলের জন্য বাড়ি থেকে বেরতেন, ফিরতেন একেবারে সন্ধ্যার পর। কোন কোন দিন বেশ রাত হয়ে যেত, কখনও কখনও সমস্ত রাতই কাবার। কোথায় কোন বাঙালীর বাড়িতে কি বিপদ, বা উৎসবই ; মাস্টারমশাই ঠিক আছেন।

অনেকটা দূরে এসে পড়লাম মূলকথা থেকে। মাস্টারমহাশয়ের কথা উঠলে অত হিসেব রেখে এগুনো যায় না।

শরীরের কথা থেকে আরও পাঁচটা কথা এসে পড়ল। অনেকদিন পরে দেখা তো! সকালেই গিয়েছিলাম। দুজনের জন্য জলখাবার এসে পড়ল। নিমকি, হালুয়া। এখানকার এ খাবার নয়। মুখ

নিচু করে দেখছিলাম, মনের প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে মাস্টারমশাই বললেন—"যা ভয় করছ তা নয়। অত ভদ্র হইনি—ছোলা, মুড়ি, চিঁড়েভাজা, ছাতু এই সবই চলে আমার এখনও।"

"তাহলে, মাস্টারমশাই"···লজ্জিতভাবে প্রশ্ন করলাম।

"তুমি এসেছ···অনেকদিন পরে।"

"আমিই অত ভদ্র হয়ে ফিরব এরকম কামনা করেন ?"

হাসলেন। বললেন—"না ; আমি শিষ্যাৎ পরাজয়টা মেনে নিচ্ছি শৈলেন ; ভুল হয়ে গেছে। নাও, আরম্ভ করো।"

"আপনি আর একটু ভুল করলেন মাস্টারমশাই···"

কুকুরটাকে একখানা নিমকি দিয়ে এক খামচা হালুয়া তুলে নিয়েছেন, ঘুরে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"আবার কি ভুল দেখলে ?"

"ওকে ঘিয়ের জিনিস দিচ্ছেন। নিজেই তো ঘিয়ে-ভাজা একেবারে।"

মাস্টার মহাশয়ের মুখের চেহারা হঠাৎ বদলে গেল। কয়েক মুহূর্ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—"শৈলেন, দেবতাদের পূজোয় আমরা যা সব জিনিস দিয়ে থাকি, ঘি-টাই কি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়।"

বললাম—"ওটা মানতে বাধা নেই, হোমাগ্নি নিজে তাঁদের জন্যে বহন ক'রে নিয়ে যান যখন। কিন্তু···কিন্তু মাস্টারমশাই, কুকুর আর দেবতা···"

"—এবার তুমিই ভুল করেছ শৈলেন—একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, বলাই ঠিক। যুধিষ্ঠির যখন মহাপ্রস্থান করেন তখন আর সবাই-ই রাস্তায় থেকে গেল, সঙ্গে যেত পারল মাত্র এক সারমেয়।···দেবত্ব তুমি কাকে বলবে ?"

কথাটাকে হাল্কা করে ফেলা যেত, কেননা কুকুরকে ঘি খাওয়ানোর (হয়ত ঐ ঘিয়ে-ভাজা কুকুরকে) আমার আপত্তিটা ছিল অন্য-ধরনের। কিন্তু ওঁর আবিষ্ট ভাব দেখে হাল্কার দিকে যেতে পারলাম না আর।

চুপ করেই খাবারে মনঃসংযোগ করেছি, মাস্টারমশাই বললেন—"শৈলেন বোধ হয় মনে করছ মাস্টারমশাই নিজেকে যুধিষ্ঠির বলতে চান…"

হেসে বললাম—"মনে করাকরি নয়, মাস্টারমশাই। বলতে চান আর না-ই চান, আমি তো তাই ব'লেই জানি।"

আরও আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন, বুঝলাম কথাটা কানে যায়নি। হালুয়াটা হাতেই ছিল, সেটা ওর সামনে ধরে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—"আমার পক্ষে লিয়ন সত্যিই দেবতা হয়ে দেখা দিয়েছিল শৈলেন। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। তুমি লিখছ আজ-কাল, বলে রাখি, কখনও ইচ্ছে হ'লে লিখে রেখো।…হ্যাঁ, লিখেই রেখো, আমি খুব তৃপ্তি পাব শৈলেন। জান তো—'লাভ মি, লাভ মাই ডগ্।"

আস্তে আস্তে হাত বুলাতে লাগলেন লিয়নের গায়ে। আরম্ভ করলেন—

"আমার অনেক রকম আজগুবি খেয়াল মাথায় ঢোকে সে তুমি জান, গত বছর আমের সিজ্‌নে যেটা এসে জুটল সেটা আবার একটু বেয়াড়া রকমের আজগুবি। ঠিক করলাম, আম চালানি ব্যবসা করতে হবে। ঐ সময় কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, ছাপরা—চারিদিক থেকে ফড়েরা আসে, বাজারে এক-একখানা ঘর ভাড়া করে গাড়িগাড়ি আমের চালান দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে যায় এখান থেকে। আমরা রয়েছি এখানে, অথচ একেবারেই ওদিকটা ভাবি না। নয় আড্ডা, নয় পাশ করার চিন্তা, নয় কেরানিগিরির জন্যে বিজ্ঞাপন খোঁজা। তুমি বোধ হয় জান না, বাগানগুলো এখানে প্রায় তিনবার ক'রে হাতফের হয়। একজন হয়তো শ্রীপঞ্চমীর কাছাকাছি গাছে মৌল দেখা দেওয়ার সময় কিনে নিলে বাগানটা। মটর হলে সে সুবিধে দেখে আর একজনকে বিক্রি ক'রে দিল। তারপর চোত-বোশেখের ঝড়-ঝাপটা গেল, ঝড়তি-পড়তি যা হওয়ার হ'য়ে গেল গাছে,

তখন আবার অন্য এক খরিদ্দার এসে দাঁড়াল, হাত-ফেরতা হয়ে গেল বাগান। সবক্ষেত্রেই যে এই হচ্ছে এমন নয় অবশ্য; তবে হয়। আমি ঠিক করলাম একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাগান হাতে রাখব। একটা বেশ বড়গাছের রিস্‌ক্, এক-আধ মাসের ব্যাপার নয় তো, কিন্তু একটা ঝোঁক চেপে গেছে, নেমে পড়লাম।

শহরের মধ্যে বা কাছাকাছি বাগান যে নেই এমন নয়, কিন্তু মাথায় ভূত চেপেছে, আমি সে-সব দিকে গেলাম না। বেলা থেকেও অনেক উত্তরে যে রেলের গুমটিটা আছে দেখে থাকবে, যেটা পেরিয়ে নেপালের বড় সড়কটা পূব হয়ে উত্তরের দিকে চলে গেছে। সেই গুমটি থেকে নেমে আরও প্রায় মাইলখানেক দূরে রাজার একটা খুব বড় বাগান আছে, রেলের ধারে ধারে মাঠ ভেঙে যেতে হয়। সেই বাগানটা ডাকে কিনে নিলাম আমি। প্রায় ষাট বিঘার ওপর টানা বাগান—বাছা বাছা গাছ, শুধু বোম্বাই, কিষুণভোগ, মালদহ, ফজলি। মৌলে ভেঙে পড়ছে ডাল। বাগানের এদিক থেকে ওদিক নজর যায় না। দিনের বেলায় সূর্যের সঙ্গে দেখা নেই, রাত্তিরে হাত কুড়ি-পঁচিশ পরেই সমস্তটা যেন কালিলেপা।

ওদিকটায় তোমরা কখনও গেছ কিনা জানি না। সমস্ত জায়গাটা খানা-খন্দর, ছোটবড় জলা আর সুঁতিতে ভরা। ত্রিশ-ভোমরার প্রায় এক ফার্লঙের লম্বা বাদশাহী পুলটা দেখেছ নেপাল সড়কের ওপর, ত্রিশটা খিলানের ওপর গড়া—সেটা দেখে এমন অনুমান করা ভুল নয় যে, কমলা নদীটার একটা খুব বড় ধারা কোনকালে এইখান দিয়ে নিশ্চয়ই বয়ে গিয়েছিল, তারপর সরে যেতে বা শুকিয়ে গিয়ে সমস্ত অঞ্চলটাকে এইরকম তছনছ করে দিয়েছে। মানুষের বাসের একেবারে অযোগ্য, সড়কের ধারে ধারে ঐ যে ক'খানা ছাড়া-ছাড়া বাড়ি দেখেছ সেই শেষ। যে বাগানটা নিয়েছি তার শেষ দিকে উত্তর-পূব কোণে সুঁতির ওপর এদিককার শ্মশানটা; বেলা, সোনহান, নবটোলি, এইসব জায়গার লোকেরা ব্যবহার করে। একটু তোমাদের সাহিত্যের ভাষায়

বলতে গেলে, মানুষের বসবাসের পর যেন পূর্ণচ্ছেদের দাঁড়ি টেনে দিয়েছে শ্মশানটা।

বাগানটা নিয়ে আমি তার মাঝখানে পরিষ্কার জায়গা দেখে একটা ছোট চালাঘর তুলে ফেললাম। মৌল ধরেনি এইরকম কিছু কিছু ডালপালা ছাঁটিয়ে দিয়ে একটু ঝরঝরেও করে নিলাম।

যতদিন মৌল রইল ডালে, তারপর মৌলও ঝরে গিয়ে মটর দেখা দিল, ততদিন শুধু মাঝে মাঝে এক-একবার গিয়ে দেখে আসতাম ফসলের অবস্থা কিরকম দাঁড়াতে পারে। আমের গুটি আরম্ভ হয়ে গেলে একটা লোক রেখে দিলাম। বাগান থেকে পোয়াটাক দূরে নেপাল সড়কের ধারে বাড়ি, নাম ভুখন। এই সময়টা কিছু বানরের উপদ্রব হয়। ঠিক হোল ভুখন সমস্ত দিন ওখানেই থাকবে, ঘুরেফিরে পাহারা দেবে। রাত্তিরে বাদুড়ের অত্যাচার আরও বেশি। রীতিমতো কড়াক্রান্তি হিসেব করে নেমেছি, ইচ্ছা ছিল রাত্তিরেও পাহারা দেবে, রাজি হোল না। কাছেই শ্মশান, একরাশ গল্প উপস্থিত করল আর পরামর্শ দিল, ওদের গ্রামের বুড়ী ডাইনী বৌদির দিদিমাকে যদি এ-কাজে নিয়োজিত করি তো ফল ভালো হয়, সে 'দানা' আর চুড়েল' গোটাকতক লাগিয়ে রেখে দিতে পারে, তাতে চোর ছ্যাঁচড়ে বাগানের ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে পারবে না। জানো তো—ভূতের মধ্যে এ দুটো জাত নাকি এ-ধরনের কাজে বেশি দক্ষ।

কথাটা এইখানেই শেষ হলো। রাতের ব্যবস্থা আপাতত রইল বাকি। চোত, বোশেখ, জ্যৈষ্ঠ কেটে গেল এই ভাবে। তারপর আম পাড়বার সময় এসে পড়ল। শহরের বাজারে চারিদিক থেকে ব্যাপারীরা এসে ঘর ভাড়া করে বাঁশের ঝুড়ি কিনে বোঝাই করছে, ঘুরে ঘুরে বাগান দেখছে, আমার কাছেও আসছে, ব্যবসার যে একটা উন্মাদনা আছে সেটা আমার বেশ ভালো করে পেয়ে বসল। এর মধ্যে একদিন তদারকে ঘুরতে গিয়ে যখন একটা গাছ একটু হালকা মনে হোল, আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। পাহারায় গাফিলতি

হচ্ছে বলে দুখনটাকে খুব একচোট বকাবকি করলাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম যতই পাহারা দিক, নিজের ওপর তো দেবে না ; যদি লোক বাড়িয়ে দিই তো গাছ খালি করার বরং আরও সুবিধেই হবে ওর। ঠিক করলাম নিজেরাই নেমে পড়ব। দিনের বেলায় থাকবে আমার ছোট ভাই ক্ষীতু, রাত্তিরে থাকব আমি।

এই ব্যবস্থাই চালু করে দিলাম। ক্ষীতু সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে প্রায় সমস্ত দিনটাই ওখানে কাটাত। আমিও এদিকের কাজ সেরে রাত্তিরে একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে নিয়ে চলে যেতাম। ততক্ষণ দুখন একলাই থাকত, আমি গেলে ও ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে আসত, তারপর রাতটা আমরা পারাপারি করে জেগে পাহারা দিতাম। সেই প্রকাণ্ড বাগানে অবশ্য ঘুরে ঘুরে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়, তবুও বার দুইতিন আমরা তাও করতাম দুজনে একসঙ্গে, ওর হাতে লালঠেন আর আমার হাতে বন্দুক, মাঝে মাঝে আওয়াজ করছি। বাকি সময়টা পাহারার ব্যবস্থাটা থাকত অন্যরকম। বাগানের দূরে দূরে কয়েক জায়গায় একটা করে হাত তিন-চারেকের বাঁশ থাকত পোতা, মাথাটা চার খণ্ড করে চেরা। একটা বাতার মাথায় দড়ি বেঁধে দড়ির একটা খুট আমাদের চৌকির পায়ায় রাখা হোত, তার পর একবার এ-দড়ি একবার ও-দড়ি টান দিয়ে ছেড়ে দিলেই সেখানে ফটাস্ ফটাস্ করে আওয়াজ হোত। স্প্রিংএর মতন আর কি, একটা দেশী পদ্ধতি। এতে বাদুড়গুলো বসতে পেত না, কোন মানুষের আম চুরির মতলব থাকলেও টের পেত আমরা জেগে আছি। এর মাঝেও এক-একবার করে বন্দুকের আওয়াজ করে দেওয়া হোত যাতে টের পায় জেগে আছি হাতিয়ার-বন্দ্ হয়েই। বেশ চলতে লাগল শৈলেন।

যে-রাত্তিরের কথা হচ্ছে, সেটা কৃষ্ণপক্ষের রাত্তির। তিথিটা ঠিক মনে নেই তবে সবে পূর্ণিমা গেছে, চাঁদ উঠতে প্রায় প্রহরখানেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। শহরে একটু কাজ পড়ে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরতে বেশ

দেরি হয়ে গেল আমার সেদিন! দুখনটা সমস্ত দিন বাগানেই থাকে, আমি গেলে সে খেয়ে আসতে যাবে। আমি আর খেতে বসলাম না। তাড়াতাড়ি খানকতক লুচি ভাজিয়ে নিয়ে সেগুলো একটা এলুমিনিয়মের কৌটোয় পুরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সেই রাত্রে আমার লিয়নের সঙ্গে পরিচয়টা হোল। সে-রাত্রে যে অভিজ্ঞতাটুকু হোল আমার জীবনে তা থেকে আমার মনে, যাকে অন্ধবিশ্বাস বলা যায় সে-জিনিসটা যেন একটু একটু করে এসে পড়েছে শৈলেন। কথাটা অবশ্য তখন স্ট্রাইক করেনি, তবে পরে আমার মনে হয়েছে কুকুরটা যেন আমার জন্যেই বিশেষ করে প্রতীক্ষা করছিল সেদিন। রেলগুমটির কাছে রাস্তার ধারেই থাবায় মুখ চেপে পড়েছিল, আমায় দেখেই বেশ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে এগুল। প্রথমটা ভয়ই পেয়ে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলাম। তারপর খুব যেন পরিচিতের মতন করে ল্যাজ নেড়ে এগিয়ে এসে পা শুঁকতে আমিও মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করলাম। আমার টাইগারটা কিছুদিন আগে মারা গেছে, গুমটিম্যানটাকে জিগ্যেস করে যখন জানলাম ওর কুকুর নয়, দেখছে আজ এই প্রথম, তখন এডপ্ট্ করাই ঠিক করলাম। বাগানটা নিয়ে একটা কুকুরের কথা ভাবছিলাম—অবশ্য যেমন বললে, এ-রকম ঘিয়েভাজা কুকুরের কথা কেউ ভাবে না, তবে আপাতত যখন পেয়ে গেলাম, ছাড়লাম না।

কমলিই ছাড়ল না, একথাও বলতে পার। যেতে যেতে বার দুই এও মনে হোল ঘেয়ো কুকুর হয়ত, রাত্তিরে ঠিক বুঝতে পারছি না, খেদিয়েই দিই। চেষ্টাও করলুম, দ্বিতীয়বার বন্দুকের নলটা টিপ করেও। গেল না। তখন কৌটো থেকে একটা লুচি বের করে ওকে আনুষ্ঠানিক ভাবে এডপ্ট্ করেই নিলাম। 'লিয়ন লিয়ন' বলে মাথায় হাত বুলিয়ে ওর নামকরণটাও সেরে নিলাম। ওর চেহারার দৈন্যটা নামের গৌরব দিয়ে ঢেকে দেওয়া আর কি। ব্যাটা স্থির হয়ে আত্মকাহিনীটা শুনছে দ্যাখো না!"

মাস্টারমশাই বারকয়েক মাথায় হাতটা বুলিয়ে দিলেন।

বাগানে পৌঁছুতে দুখন বললে—"একবার দুজনে মিলে ঘুরে আসতে হবে। বেচারার এমনিই দেরি হয়ে গিয়েছিল, আমি জিগ্যেস করতে বললে—"রৌদির সেই ডাইনী দিদিমাবুড়ী মারা গেছে, তাকে দাহ করতে নিয়ে এসেছে। দলটা বেশ বড় ; কিছু ভেঙে বাগানে ঢুকে পড়ে আম চুরিতে লেগে যেতে পারে এই সুযোগে। একবার ঘুরে বন্দুকের আওয়াজ করে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, আমরা আছি।

কথাটা সমীচীন বৈকি, বেরিয়ে পড়লাম দুজনে, লিয়ন রইল পিছনে। ঘুরতে ঘুরতে শ্মশানের ধারেও গেলাম একবার। রৌদির সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। বুড়ী-দিদিমা মারা গেছে, খুবই যে শোকাচ্ছন্ন এমন নয়, তবে বলল—আমের সময় সামনেই বাবু, বুড়ী আম খাওয়া হোল না বলে আপসোস করতে করতে মারা গেল—দুদিন পরেই পাকচে আম, এই একটা দুঃখ থেকে গেল মনে।

বুড়োমানুষের মৃত্যু, সবাই হাল্কাভাবেই নেয়, দলের একজন ঠাট্টা করে বলল—তা খাক না কত খাবে। শহরের সেরা আমবাগানে তো রেখে গেলুম ওকে, কি বলুন মাস্টারবাবু ?

হেসে বললুম—মাস্টারবাবুর কাছে বন্দুক আছে সেটারও যেন খোঁজ রাখে বুড়ী।

বুড়ীর গল্প শুনতে শুনতেই ফিরে এলাম ঘরটাতে। বিশ্বাস করি না, তবু আজগুবি অনেক রকম গল্পই তো গড়ে ওঠে ওদের নিয়ে। দুখন দুটো কলকে সেজে তার একটাতে আগুন দিয়ে আমার গড়গড়ায় চাপিয়ে দিল, অন্যটা পাশে রেখে চলে গেল। যেতেই চাইছিল না, আমিই পাঠিয়ে দিলাম ; বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বরং ঠাট্টা করেই এও বলে দিলাম—যদি না আসতে পার ক্ষতি নেই। বুড়ী আমার কিছু করতে পারবে না। দুখন চলে গেলে আমি লুচি কখানাও খেয়ে নিলুম, খান তিনেক লিয়নকে দিয়ে। জৈষ্ঠের গরম, তখন বৃষ্টিও নামে নি, তায় অত বড় একটা আমবাগানের একেবারে মধ্যিখানেই তো,

অবস্থাটা ত বুঝতেই পারছ। চালাঘরটার সামনে একটা চৌকি থাকত, তাতে শতরঞ্জির উপর একটা সুজনী পাতা ও একটি বালিশ; আমি খাওয়া সেরে এক হাতে পাখা আর এক হাতে গড়গড়ার নলটা নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লুম। নিচু চৌকি, লিয়ন পাশে থাবায় ভর করে বসে রইল।

এক সময় বাগানের ওপারে সুঁতির ধারে শবযাত্রীদের সমস্বরে আওয়াজ উঠল—রাম নাম সত্য হ্যায়। ওরা দাহ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে। আওয়াজটা আরও বার পাঁচ-ছয় হোল, শেষেরটা বহু দূরে। এর পরই চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাটা কি বলো দিকিন শৈলেন?"

গল্প ছেড়ে হঠাৎ প্রশ্নটায় একটু হকচকিয়ে গেছি, মাস্টারমশাই নিজেই বললেন—"ডানপিটে, কুস্তিগার, ভয় কাকে বলে জানি না—এই তো? নিজেও ঠিক তাই বলেই জানি নিজেকে, কিন্তু সেদিন তুখন চলে যেতে শুয়ে শুয়ে মনে হোল—লোকটাকে না যেতে বললেই যেন ভালো হোত, নিজেই যখন চাইছিল না যেতে; সঙ্গে খাবারও তো ছিলই।

চিন্তাটাকে অবশ্য অন্য চিন্তা দিয়ে ঠেলে ঠেলে সরিয়েই দিলাম শেষ পর্যন্ত। তামাকটা পুড়ে এলে উঠে অন্য কলকেটায় আগুন দিয়ে গড়গড়ায় বসিয়ে আবার নলটা হাতে করে শুয়ে পড়লাম।

এর পরে একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার, যা ব্যাপারটা হোল তাতে গোলমাল হওয়াটা আশ্চর্যও নয়। ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি জেগেই ছিলুম কি ঘুমিয়েই পড়েছিলুম, তারপর হঠাৎ জেগে উঠি। সেদিন শহরে বেশ একটু ঘোরাঘুরি আর খাটুনি হয়, তাই থেকে মনে হয় বোধ হয় গাঢ়গোছের একটু তন্দ্রাই এসে গিয়ে থাকবে। যাই হোক, শুয়েই ছিলাম চিৎ হয়ে, হঠাৎ সামনে আমার নজরটা গেল আটকে। আগেই বলেছি, আমি চালাটা তুলেছিলাম বাগানের মাঝামাঝি একটা খালি জায়গা দেখে। পুরনো হয়ে যাওয়া গোটা তিন গাছ কাটিয়ে ফেলা হয়েছে সেখানে, আরও একটা আপনিই আধ্-শুকনো হয়ে এসেছে। আমার হঠাৎ মনে হোল ঠিক সামনে হাত

দশ বারো দূরে যে গাছটা দাঁড়িয়ে তার একেবারে মাথায়—সে কি করে বর্ণনা করি?—মনে হোল ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালপাতার সঙ্গে মিশে একটা হাত কখন এসে পড়েছে—রক্ত-মাংসের হাত নয়, ধপ ধপ করছে সাদা—একটা কঙ্কালের হাতের আঙ্গুলগুলো যদি ফাঁক ফাঁক করে ছড়িয়ে রাখা হয় তাহলে যেমন দেখতে হয়, যেন সেইরকম! তবে পাঞ্জাটা অনেক বড় আর কোন্ আঙ্গুলটা কোথা থেকে আরম্ভ হয়ে কোথায় শেষ হয়েছে তার যেন ঠিক নেই। হঠাৎ নজরে পড়া, প্রথম খানিকক্ষণ তো চোখ ফেরাতেই পারলুম না, তারপর অনেক চেষ্টা করে, মনের সঙ্গে অনেক যুক্তি করে একটা অগ্রাহ্যের ভাব এনে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে নোব, ওরই লাইনে হাত ছ'সাত ডানদিকে ঠিক ঐ ব্যাপার—ঐরকম একটা পাঞ্জা—শুধু হাড়, ঝকঝক করছে গাছের ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে। একদৃষ্টে চেয়ে আছি আমি, জ্ঞানটা স্পষ্ট, মনের সঙ্গে যুক্তিটা চালিয়েও যাচ্ছি, কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, ঘাড় ফেরাবার ক্ষমতাটা হারিয়ে বসেছি, ভয় হচ্ছে এইরকম একঠায় চেয়ে কাটাতে হবে নাকি আমায়, ঢুখনটা না আসা পর্যন্ত! আরও ভয় হচ্ছে, না-ই যদি আসে সে! এমন কি আপ-সোসের ভাবটাও বেশ অনুভব করছি—কেন তাকে ঠাট্টা করেই বা আসতে বারণ করেছিলুম।

একটা বিশ্রীরকম অসহায় ভাব—লেখক নই তো, ঠিক বর্ণনা করতে পারছি না। সময়ের জ্ঞানটাও যেন মিটে গেছে। কতক্ষণ গেল ঠিক বুঝতে পারছি না, তারপর ভয়ের যা একেবারে শেষ অবস্থা—মরিয়া হয়ে উঠলুম—ঘাড় না ফেরাতে পারি, উঠে বসব। মনে আছে দুটো কনুইয়ে চাড় দিয়ে সে এক অমানুষিক চেষ্টা করে ঠেলে উঠতে যাব, কনুই দুটো যেন পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেল। পড়ে গেলাম আবার চৌকিটার ওপর। এবার সেই হাত দুটোয় স্পষ্ট একটা মুভমেণ্ট—মনে হোল আমার উঠতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটো যেন চঞ্চল হয়ে উঠল—ঠিক একটা থাবা মারার ভাব। একটা সেকেণ্ডও নয়

অবশ্য, তখুনি গেল দাঁড়িয়ে। তারপরেই আরম্ভ হয়ে গেল—

হাত থেকে আরম্ভ করে ক্রমে মুখ, গলা, বুক, কোমর, পা, পায়ের আঙ্গুল নিখুঁত একখানি কঙ্কাল, শুধু সচরাচর যা দেখতে পাই তার চেয়ে বোধ হয় বিশগুণ বড়ো। এগিয়ে আসছে, আর সে রকম হঠাৎ-চঞ্চল নয়—আস্তে আস্তে—আমার দিকে এগিয়ে আসছে—মাথাটা আস্তে আস্তে হেঁট হয়ে আসছে—চোখাচোখি হয়ে আছি—ওর অবশ্য চোখ নেই। ছুটো অন্ধকার গর্ত, কিন্তু তার ভেতরই কোথায় যেন রয়েছে দৃষ্টি; অব্যর্থ। বেশ বুঝতে পারছি, আমি কোথায় একেবারেই তলিয়ে যাচ্ছি, আর বেশি দেরি নেই। আমাদের এই পৃথিবীর আর সব অনুভূতিই একরকম শেষ হয়ে এসেছে আমার। আছে শুধু গাছের ঐ কঙ্কাল বা যাই বলো, আর এদিকে⋯সেইটেই আমায় আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে খুব যেন একটা ক্ষীণ সুতো দিয়ে রেখেছে ধরে—একটা আঁচড়ের অনুভূতি। টানা আর খুব তাড়াতাড়ি নখের আঁচড় নয়—লিয়ন আমায় চেটে যাচ্ছে—কপালে, গালে, নাকে, মুখে, চোখে, বুকে, হাতে। চেটে চেটে জিভ শুকিয়ে গেছে—আঁচড়ের চোটে সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেছে আমার।

কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছে। বুঝছ না? রক্ত চলাচলটা ঐ করে বন্ধ হয়ে যেতে দেয়নি আর কি!⋯ছাখো সব হালুয়াটা কখন অন্যমনস্ক হয়ে দিয়ে ফেললুম বেটাকে! ⋯ওরে, আর একটু হালুয়া দিয়ে যা তো, থাকে তো। এটা লিয়নের পেটেই গেছে।"

মাস্টারমশাই একটু হাসলেন। জিগ্যেস করলুম—"ব্যাপারটা⋯?"

বললেন—কিছুই নয়।

"এবার একটু তাচ্ছিল্যের হাসি, যেন নিজের ওপর ব্যঙ্গ করেই। বললেন—" পড়ে ঐভাবে চেয়ে গোঁ গোঁ করছি, কানে গেল—'ধীরুবাবু! ধীরুবাবু!'—তুখন একটু তাড়াতাড়িই চলে এসেছে। বৌদির দিদিমা আম না খেতে পাওয়ার আপসোস নিয়ে মরেছে, কি কাণ্ডটা করে বলা যায় না তো। ডাকে সাড়া না পেয়ে বেশ একচোট

নাড়া দিতে আমি—'এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা'—বলে ঘুরে চাইলাম ওর দিকে। বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নামিয়ে খুব বড় একটা নিশ্বাস পড়ল। তুখন জিগ্যেস করল—কী? অমন করছিলেন কেন?

পুরো সাড়টা ফিরে আসেনি তখনও; আমি ওপরের দিকে আঙ্গুলটা তুলে ধরলুম।

কৈ কিছু নয় তো! বলে একটু চেয়ে থেকে ওর চোখ তুটোও যেন কি রকম হয়ে এসেছে, আমিই একটা ঠেলা দিয়ে বললুম—তুই আগে এক ছিলিম সাজ তাড়াতাড়ি, অনেকক্ষণ খাইনি তামাক।

ওর মতিভ্রমের মুখেই আমার চৈতন্যটা পুরোপুরি ফিরে এসেছে আর কি। ততক্ষণে বাগানের পিছনে চাঁদটাও অনেকখানি উঠে এসেছে তো। কঙ্কাল টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমারও লোকের সঙ্গ পেয়ে সাহস ভালো ভাবেই ফিরে এসেছে।

আর অর্জুনের মতন সে-অবস্থা নেই ভো। কীর্তিটা যে নিতান্ত এই উঠতি চাঁদেরই, সেটা আকাশে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে যে কঙ্কালও এগিয়ে এসেছে আমার দিকে···"

"বললাম"—কিন্তু অর্জুনের কথাটা তো বুঝলাম না মাস্টারমশাই।

"বুঝলে না?"—একটু হেসেই বললেন মাস্টারমশাই—"অর্জুনের মনের একাগ্রতা ছিল খুব বেশি। গুরুর কাছে বাণ-ছোঁড়ার পরীক্ষা দিতে গেলেন, পাখির চক্ষু ভিন্ন আর কিছু দেখতে পেলেন না,—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরেও তাই। তাঁর ছিল ওটা স্বাভাবিক শক্তি। আমার ভয়ের তাড়সে ঐ একাগ্রতা এসে গিয়েই তো অবস্থাটা এইরকম দাঁড়িয়েছিল —সব মুছে গিয়ে শুধু রৌদির দিদিমার কঙ্কালটা ছিল দাঁড়িয়ে— একমনে তাঁর হাত, পা, মুখ, দাঁত, চোখ—এমন কি হাসিটুকুও স্পষ্ট করে তুলেছি—লিয়ন না থাকলে ঐ একেকে সামনে রেখে আমি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিলুম।—নয় কি?"

হালুয়া এসে পড়ল। এবার বাটিটা সুদ্ধ ওর সামনে ধরে দিলেন মাস্টারমশাই।

"তিক্ত ঔষধ"

হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ছে তখন থেকেই নীরার দুষ্টু বুদ্ধিটা বেশ প্রবল। ছোটখাট ফষ্টিনষ্টি তো আছেই, কাউকে জব্দ করতে হবে, কোন বদ অভ্যাস ছাড়াতে হবে কারুর, বুদ্ধি যোগাবে নীরা। এপ্রিল-ফুল করার নূতন নূতন ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবনে ওর জুড়ি ছিল না হোস্টেলে। প্রফেসাররা পর্যন্ত বাদ যেতেন না।

বদ অভ্যাস ছাড়াতে হলে ঔষধটা একটু তিক্ত-কটু হয়েই পড়ত, তবে একটা ক্ষমতা ছিল, তার আস্বাদটা মুখে বেশিক্ষণ থাকতে দিত না নীরা। সবার গেল, শুধু ওর অভ্যাসটা যে গেল না তার কারণ এক কথায় বলতে গেলে নিশ্চয় এই যে, উপযুক্ত চিকিৎসক ছিল না; তবে নীরা বলে ওর ওটা বদ-অভ্যাসই নয়, হলে নিজের চিকিৎসা নিজেই করত।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে অভ্যাসটা আপনিই চলে যেত। ছোট সংসার, সুযোগ কম; তা ভিন্ন আর তো সে হালকা জীবন নয়; খাও দাও, একে জ্বালিয়ে ওকে হাসিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, শুধু বছর শেষে একটু পাসের ভাবনা। ছেড়েই যেত অভ্যাসটা, জীইয়ে রাখল স্বামী মৃগেন। একে তো স্বামীই; পাঁচজনের কাছে গুরু বলে স্বীকার করে নিলেও পাঁচজনের চোখের আড়ালেও ও-সম্বন্ধটা ধরে থাকলে তার মধ্যে আর রস-কস কিছু থাকে না, তার ওপর ঠুকে-ঠুকে একটু মেরামত করে নিতে হচ্ছে নীরারটিকে, কিম্বা ঔষধপত্র দিয়ে নির্দোষ-নীরোগ; যাই বলা হোক। অবশ্য সব স্ত্রীকেই তাই করে নিতে হয়, কম-বেশ করে, কেই বা বিয়ের পিঁড়িতে বসার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ স্বামী পেয়ে যাচ্ছে; তবে নীরার ব্যাপারটা একটু আলাদা।

আর কিছু নয়, অনেকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি সুদ্ধ পেয়েছিল মৃগেনকে। নিজের শক্তিচয়কে নিত্যই কাজে লাগিয়ে আসতে হয়েছে নীরাকে।

ফল পেয়েছে। অত্যন্ত বদরাগী ছিল মৃগেন, থালা ঘটি পর্যন্ত আছড়াত, সে দোষটা গেছে। হাসি কাকে বলে জানত না, শিখেছে ; যে সব পরিস্থিতিতে থালা ঘটি আছড়াতো সে সব পরিস্থিতিতে কোন কোন সময় হেসেই হাল্কা করে ফেলে নিজেকে আজকাল। ক্লাব—আড্ডা অনেকটা কমেছে। বেটাছেলে, তার একেবারে কমুক এ দোষটা, এরকম চায়ও না নীরা। যারা পছন্দ করে যে অষ্টপ্রহর বাড়িতে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকুক তাদের দলের মেয়ে নয়। বিয়ে করেছে তো পুরুষ মানুষকেই। শুধু নজর রেখে যাচ্ছে এই বহির্মুখিনতার সূত্র ধরে কোন রোমান্সের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে কিনা স্বামীর।

যেন একটু আছেই বলে সন্দেহ হয় নীরার। প্রথমতঃ, সব স্ত্রীরই একটু হওয়া ভালো, দোষটা থাকুক বা নাই থাকুক। দ্বিতীয়তঃ, মৃগেনের নাকি বিয়ের ওদিকে ছিলই একটু-আধটু এই রকম শোনা আছে নীরার।

শুধু যে কানেই শুনেছে তাও তো নয়। নীরারই যে আশা এ বাড়িতে তার ইতিহাস শোনবার জন্য ওকে তো পরের দ্বারস্থ হতে হবে না। কাকা (বর্তমানে নীরার খুড়শ্বশুর) হোস্টেলের ডাক্তার। কড়া নিয়মতান্ত্রিক মানুষ, হপ্তায় দুদিন করে নিয়মিত ভিজিট, ঘড়ির কাঁটা ধরে। একটা মাস নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে নূতন-পাস-করা ডাক্তার ভাইপোকে পাঠাতে হয়েছিল। ঐ মৃগেনকে। ফল কি হোল তা নীরার চেয়ে তো কেউ বেশি জানে না।

তবে একটিবার মার্জনা করতেই হয় জীবনে। যেটা গার্জেনের মেয়ে দেখা, পুরুতের কোষ্ঠী-বিচার—এই ধরনের সোজা পথে হওয়া উচিত ছিল, সেটা না হয় একটু আত্মচেষ্টার ওপরই হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টাকে তো আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

তাই দৃষ্টিটা একটু সজাগ রাখতে হয়েছে। ভুল যে করেনি নেহাত এটাও তো দেখতেই পাচ্ছে।

থিয়েটার হচ্ছে মৃগেনদের ক্লাবে। এক সময় ওই ছিল একজন বড় পাণ্ডা। এখন ততটা সময় আর দিতে পারে না; নীরা আছে, নিজের প্র্যাকটিসও আছে, তবু যোগসূত্রটা আছেই। বিশেষ করে যদি একটা বড় গোছের কিছু হোল—পূজা, সভাসমিতি, থিয়েটার, শখের যাত্রা, তা হ'লে এগিয়ে আসতেই হয়। বিশেষ করে থিয়েটারের সঙ্গে যোগসূত্রটা একটু বেশি রকমের। ওটা আবার একটু রোম্যান্স-ঘেঁষা জিনিসই তো।

এবারে আবার একটা নূতন পরীক্ষা হচ্ছে। মেয়ের পার্ট মেয়েরাই নেবে। নূতন অবশ্য এখানেই; কলকাতা আর কাছাকাছি সব জায়গায় তো এখন ঐ রেওয়াজই দাঁড়িয়ে গেছে। রোগ তো ছড়িয়েই পড়ে, এখন এখানেও গোঁফ-কামানো 'মদ্দা-মেয়ে' দেখে সবাই নাক সিঁটকুতে আরম্ভ করেছে। মেয়েরাই নাকি বেশি; ওরা তো আবার ওটাকে ওদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ বলেই মনে করে।

মেয়ে আসছে দু'জন, তাদের সঙ্গে একজন পুরুষও। যে বইটা ধরা হয়েছে—একখানি ঐতিহাসিক নাটক, তাতে মেয়ের পার্ট কমই। বড় বড় দুটি পার্ট এই মেয়ে দুটিই নেবে। আরও গুটি দু'য়েক আছে এবং সেট-কে-সেট কলকাতা থেকেই আনবার কথা উঠেছিল, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হয় নি। নূতন পরীক্ষা, খরচ আছে বেশ। তবে এটা বাইরে-বাইরেই প্রচার করা হয়েছে। ভেতরের কথা, অর্থাৎ ওপরের যে কয়জন ক্লাবের পলিসি নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁদের মনের কথা যারা এতদিন মেয়ের পার্ট নিয়ে এসেছে তাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার করে ফেলতে চান না। এটা তো একটা পরীক্ষাই, কোন কারণে সফল না হলে আবার তো ওদেরই ভরসা। যাদের একেবারে না হলে চলবে না, তাদের বাকি দুটা পার্ট দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখা হয়েছে। একটা ড্রামাটিক ক্লাব চালানো আর একটা রাজ্য চালানোর বিশেষ কোন প্রভেদ নেই তো।

ঐ পলিসিরই অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে ওদের সঙ্গী পুরুষটিকেও

একটি পার্ট দেওয়া হয়েছে। পুরুষের পার্ট নেওয়ার লোক যথেষ্ট আছে, তবে ওকে পার্ট দেওয়া শর্তের একটা অঙ্গ। ওই মেয়ে দুটির অভিভাবক হয়ে আসবে। পুরুষ অভিভাবক বলতে যে ধারনাটা মনে উদয় হয়, সে রকম অবশ্য কিছু নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবা একজন। মেয়ে দুটি নাকি খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো বোন ; যুবকটি ওদের জ্যেঠতুতো জ্ঞাতিভাই, আর একটু দূর সম্পর্কের জ্যেঠার ছেলে।

পার্ট দেওয়া হয়েছে হীরো অর্থাৎ নাটকের মূল নায়কের নয়, তবে সাধারণ অর্থে হীরোরই, খুব বীর-রসের একটা লাফালাফি দাপাদাপির ভূমিকা। যুবকের চেহারা আছে। নাম তপেশ।

বড় মেয়েটি যে নায়িকার পার্ট নিচ্ছে, বছর বাইশ-তেইশের। নাম তমাল। ছোটটির নাম তনু, বছর দুয়েকের কম হবে।

তমাল মেয়েটি বেশ সুশ্রী এবং স্মার্ট।

ঠিক হয়েছে ওরা হপ্তায় একবার করে আসবে। শনিবারের রাত্রি এবং রবিবারের দুপুরে রিহার্সেল দিয়ে চলে যাবে। থিয়েটারটা হবে মাস দেড়েক পরে।

মৃগেনদেরই পাড়ায় একটা ছোট্ট বাড়ি খালি পড়ে আছে, যাঁদের বাড়ি তাঁরা মাস দুয়েকের জন্য বাইরে চেঞ্জে গেছেন। ওরা এলে ঐ বাড়িতে থাকবে ঠিক হয়েছে। খাওয়ার ব্যবস্থা, বাড়ির চাকরটাই রেঁধে বেড়ে দেবে, রসদ যোগাবে ক্লাব। রীতিমতো তোয়াজ করতে হচ্ছে।

তবে সার্থকই। তনু আর তপেশ এমন বিশেষ কিছু নয়। তনু মেয়ে, তপেশের চেহারাটা আছে, এই যা ওদের স্বপক্ষে, তবে তমাল একাই যে নাটকটা দাঁড় করিয়ে দেবে এতে আর সন্দেহ নেই কারুর। যেমন স্টেজমানানো চেহারা, তেমনি স্টেজ-ফ্রী, তেমনি ডেলিভারি বা পার্ট বলার কায়দা। বইটা ট্রাজেডী, কাউকে যে শুকনো চোখে বাড়ি ফিরতে হবে না, এটা ঠিক।

মেয়েটি এদিকেও ভালো। মেম্বারদের বাড়িতে থাকা খাওয়ার

ব্যবস্থা করতে পারলে ক্লাবের সুবিধা হোত, ভাগাভাগি করে নিঃখরচায় চলে যেত, ওই রাজি হয়নি। তাইতে মনে হয়েছিল বোধ হয় দেমাকে। কিন্তু দেখা গেল মোটেই তা নয়। বেশ মিশুকে এবং আমুদে-আহ্লাদে। ওরা তিনজনে সন্ধ্যার গাড়িতে এসে পেঁছায়, নেয়ে ধুয়ে একেবারে রিহার্সেলে চলে যায়, আর সময় পায় না। তবে রবিবার সকালে তোয়ের হয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়ে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আলাপ ক'রে আসে। অবশ্য সেধেও নয়, গায়ে পড়েও নয়। ক্লাবের মেম্বারদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাদের তরফ থেকেই নিনন্ত্রণটা হয়—মা দেখতে চান···স্ত্রী আলাপ করতে চায়, সময় হবে কি সকালের দিকে?

যায় দুই বোনেই শুধু; কাছে হোল তো হেঁটেই, দূরে হোল তো রিক্‌শা ক'রে। এক বাড়ির পরিচয়ে অন্য বাড়ি, তারপর আবার অপর এক বাড়ি। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে অভিনয় তো ব্যবসা নয়; এই করে নাকি দুই বোনের কলেজের খরচ চালাচ্ছে। আলাপ-পরিচয়ে মেয়েদের মধ্যে বেশ খাতির জমিয়ে নিল।

খাওয়ার নিমন্ত্রণও হতে লাগল বার তিনেক আসার পর থেকেই। সেটা অবশ্য তিনজনেরই। ক্রমে যেটা পাকা ব্যবস্থা হিসাবে আগে করা যায় নি, সেইটেই হয়ে গেল পাকা। নিমন্ত্রণটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। বাসায় রান্নার পাট গেল উঠে।

নীরার সঙ্গেও পরিচয় হোল। ও-ও কলেজে পড়া মেয়ে, অভিনয়েও নাম ছিল, সেই একটা সূত্র; তারপর যখন প্রকাশ পেল তমালেরা সেই কলেজেরই ছাত্রী, বছর চারেক আগে নীরা সেখান থেকে পাস করে বেরিয়েছে, তখন পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতাতেই গিয়ে দাঁড়াল।

প্রথমটা এই ঘনিষ্ঠতার মাঝখানেও খুব সূক্ষ্ম একটা কি যেন রইল একটু ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে। মেয়েটির একটা অদ্ভূত আকর্ষণ আছে, একটা মোহই, তবু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে বাধছেও নীরার একটু, একেবারে আপন ক'রে নিতে পারা যাচ্ছে না। যে মেয়ের স্বামী

রোমান্স-ভাবাপন্ন তার ঐ এক ছুরদৃষ্ট। নীরা নিজে প্রাণখোলা মেয়ে, এই ধরনের মোহে মুগ্ধই হয়ে পড়ে, আকর্ষণে আকৃষ্টই হয়, তবে ভাবটা যদি বাড়ির অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে তো বিপদ বৈকি।

তবে এই ব্যবধানটুকুও রইল না বেশিদিন। একটু সজাগ রাখতে হোল দৃষ্টিকে, তারপরেই বুঝতে পারল গোলযোগের কিছু নেই। এদিকে এসে রবিবার সকালের নিমন্ত্রণটা নীরাদের বাড়িতেই একচেটে হয়ে গেছে। নীরাদের ছোট সংসার, তিনজনেই সকালে এসে উপস্থিত হয়, গল্পগুজব জমে ওঠে; তমাল আবার বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটাই যেন একাই পূর্ণ করে রাখে। কিন্তু মৃগেনের মনে যে কোন গলদ নেই, কোন কৌতূহলই নেই বিশেষ ধরনের, এটাতে আর কোন সংশয়ই থাকে না নীরার মনে।

বেশ ভালোই লাগে নীরার। সে যে এমন ভাবে স্বামীকে জয় করে ফেলতে পেরেছে, এমন নিরবশেষভাবে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলেছে এতে একটা আত্মপ্রসাদই অনুভব করে। তমালের একটা আকর্ষণ থাকলেও নীরা আর সবার মতো গোড়া থেকেই আমল দেয়নি। এখন দেখছে শেষ পর্যন্ত দিয়ে ভালোই করেছে। কথাটা হচ্ছে, জীবনে মাঝে মাঝে এই ধরনের এক একটা পরীক্ষা হয়ে যাওয়া ভালো।

পরীক্ষায় শিষ্য স-সম্মানে পাস করেছে; গুরু বেশ সন্তুষ্টই। কিম্বা যদি ডাক্তার বলে ধরা যায় তো তাহলেও। আরও বাড়িয়েই দিল তমালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটুকু। শেষ রিহার্সেলের দিন ওরা এসে একেবারে নীরাদের বাড়িতেই উঠল। নীরারই বিশেষ আগ্রহে। এলও শনিবার সকালের গাড়িতে। ছুটা দিন আগাগোড়া রিহার্সেল দেওয়া হবে বইটা। রবিবার আবার স্টেজ রিহার্সেল। ছু'টা দিন নীরাদের সঙ্গেই রইল ওরা। খুব হৈ-হুল্লার মধ্যে কাটিয়ে সোমবার সকালের গাড়িতে ফিরে গেল কলকাতায়। সামনের শনিবার অভিনয়। দৃষ্টি সজাগই রেখে গেছে নীরা, কোন কিছু গলদ নেই একেবারে।

মঙ্গল গেল, বুধ-বৃহস্পতি গেল। শুক্রবার সকালের ডাকে কলকাতার একটা নামকরা গহনার দোকান থেকে একটা রেজিস্টারি করা ছোট্ট পার্সেল এসে পৌঁছাল, আন্দাজ তিন ইঞ্চি × তিন ইঞ্চি আকারের। মৃগেন একটা কলে বেরিয়ে গিয়েছিল, নীরাই সই দিয়ে নিয়ে নিল। স্বর্ণকারের দোকান থেকে স্বামীর নামে পার্সেল, সহজ সম্বন্ধের অধিকারেই স্ত্রীর একটা আগ্রহ থাকে, খুলে ফেলল নীরা।

তার পরেই তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

একটি বড় রূপার মেডেল।

রূপার মেডেলের নামে বাজারে ছাঁচে-ঢালা যে পাতলা বাহারকাটা নিকেলের সস্তা মেডেল চলে সে ধরনের নয়। বেশ ওজনদার আসল রূপারই ফরমাশী মেডেল। গোল, একটা টাকার প্রায় দু'গুণ আকারের, কিনারাটা একটা সোনার প্লেট দিয়ে মোড়া। সোনার জল দেওয়া যে না হতে পারে এমন নয়, তবে জিনিসটার আভিজাত্য দেখে মনে হয় আসল সোনারই। ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে তো সমস্তটাই সোনার জলের করে দেওয়া যেত।

ভেতরে উৎকীর্ণ লেখাটুকু পড়ে মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল নীরার —"কুমারী তনু মিত্রকে—সার্থক অভিনয়ের জন্য—জনৈক গুণ-গ্রাহী"। গোল করে লেখা। মাঝখানে এই শহরের নাম আর অভিনয়ের তারিখ।

মেডেলটা মুঠোর মধ্যে চেপে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল নীরা। ওর গল্পের এক চক্ষু হরিণের কথা মনে পড়ে গেছে; কবে সেই ছেলেবেলায় পড়েছিল।

স্বামীর রোমান্সের নেশাটা তাহলে যায়নি একেবারে।

রোমান্স বৈ আর কি? 'স্বার্থক অভিনয়ের' সঙ্গে তনুর বিশেষ সম্বন্ধ যে নেই এটা আর সবার মতো 'মৃগেন ভালো রকমই বোঝে। বাকী থাকে রূপ। আছে রূপ তনুরও তবে তমালের ধারে-কাছে দিয়েও যায় না: বাকি থাকে একটা জিনিস; একটু "আহা!"

এই "আহা"-র চেয়ে বড় রোমান্স আর নেই। হয়তো তমালের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যই মৃগেনের মনটা অরক্ষিত তনুর দিকে গিয়ে পড়েছে। তবু নীরা জানে অবহেলিত সৌন্দর্য পুরুষের চোখে আরও কত গুণ সুন্দর হয়ে ওঠে। বছর তিন হয়ে গেল পুরুষের সঙ্গে অহর্নিশ রয়েছে, জানবে না?

না, রাগ করেনি মোটেই। রাগ কিসের। যা স্বাভাবিক, যা নিত্যই হচ্ছে তার জন্যে? কলেজ থেকে যে চল-চপল লঘু জীবনের চর্চা করে এসেছে, একে জব্দ ক'রে, ওকে হাসিয়ে—তাতে আর কিছু না হোক, জীবনটাকে খেলার ছলে, হাসির ছলে নেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর—ইংরাজীতে ওরা বেশ কথাগুলো দিয়েছে—স্পোর্টিং স্পিরিট···সেন্স অব হিউমার।

একটা কথা। খুব যদি বড় করেই দেখা যায় তো এ একটা পুরুষালি রোগই। একেবারে নীরোগ মানুষ তো চায়ও না ডাক্তারে। হাসি-খেলাচ্ছলেই এই তিন বছরে কতকগুলো রোগ তো সারাল নীরা। ভেবেছিল এটাও একেবারে গেছে, দেখছে কিছু আছে অবশেষ। একটা কড়া-দাগ ওষুধ আরও দরকার। দিতে হবে আর কি।

অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক হাতড়ে বের করতে হোল ওষুধটা। আজ একটা সুবিধা, স্টেজ-তোয়ের আর অন্য অন্য ব্যাপার নিয়ে থাকবে সবাই। মৃগেনকেও ঐ হাঙ্গামা সামলাতে বাইরে বাইরে থাকতে হবে বলে গেছে, কোনও এক সময় এসে খেয়ে যাবে। এবার অনেক ছাতু গুলেছে সবাই, তুলতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

নীরা ওদের স্বর্ণকার রামধনকে ডেকে পাঠাল। বলল—"দেখো না বিপদ, কালকে থিয়েটার, মেডেলটা দেওয়া হবে, তা একেবারে গোলমাল করে অন্য কার মেডেল পাঠিয়ে বসে আছে। কে দিচ্ছে তার নাম নেই; যাকে দিচ্ছে তার নামের জায়গায় অন্য নাম—এক

কাণ্ড ! তাও এল কখন, না শিয়রে সংক্রান্তি করে এই আজকে। ঠিক করে দিতে পারবে তাড়াতাড়ি ?"

রামধন জানাল—"শক্ত আর কি, তবে পালিশটা একটু মার খেয়ে যাবে, কলকাতার পালিশ তো এখানে হতে পারে না।"

নীরা বলল—"তা থাক। ঠিক ঠিক পড়াটা আসল কথা, পালিশ তো পরে। সেখানে গিয়ে করিয়েও নিতে পারবে।"

ভুল সংশোধন ক'রে এক টুকরা কাগজে লিখে দিল—

"বীর রস অভিনয়ের জন্য—শ্রীতপেশ দত্তকে—জনৈকা মহিলা।"

—খালি পিঠটায় এটা লিখে, ওদিকের লেখাটা চেঁচে দিয়ে যতটা হয় পালিশ একটু তাড়াতাড়ি দরকার। ঘণ্টা দুয়েক পরে নীরা নিজেই লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেবে।

তোয়ের হয়ে এলে নীরা ওটা আবার ভালভাবে প্যাক করে রেজেস্ট্রী ক'রে ক্লাবের সেক্রেটারির নামে পাঠিয়ে দিল : প্রেরকের একটা কাল্পনিক নাম আর একটা কাল্পনিক ঠিকানা ভেবে বের করতে খুব বেশী মাথা ঘামাতে হোল না। স্থানীয় পার্সেল, আজ শুক্রবার, কালই পৌঁছে যাবে। এক্সপ্রেস ডেলিভারির বাড়তি মাশুলও দিয়ে দিল।

খুবই ব্যস্ত আছে মৃগেন। প্রায় দুইটার সময় বাড়ি এল খেতে। অডিটোরিয়ামের কতকগুলো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না, আবার এক্ষুণি না বেরুলে নয়। তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দু'মুঠা ভাত-তরকারী গুঁজে উঠে পড়ল। আঁচিয়ে হাত মুছতে মুছতে মনে পড়ে গেল হঠাৎ—কিম্বা যেন হঠাৎ—প্রশ্ন করল—"ইয়ে—একটা পার্সেল এসেছিল আমার নামে ?"

"কিসের ?"—নীরা প্রতিপ্রশ্ন করল। "না"—ব'লে আর সোজা মিথ্যা কথাটা বলল না স্বামীর কাছে। আবার গুরুজনও তো।

একটু থতমত খেয়ে যেতেই হোল মৃগেনকে, তবে এত তাড়াতাড়ির একটা সুবিধা যে বেশ উত্তর এড়িয়ে যাওয়া যায়। টেবিলে কাচের বাটি থেকে পানটা তুলে নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলল—"এলে রেখে দিও।"

"দোব।"

—সত্য কথাটাই বলল স্বামীর কাছে। মুখ ঘুরিয়ে একটু হাসলও।

পরদিন এদিকের আয়োজনের হাঙ্গামা অনেকটা মিটে গেছে। মেডেলের চিন্তাটাই প্রধান হয়ে রইল মৃগেনের। একেবারে পোষ্ট অফিস থেকে ডেলিভারি নেওয়া নিরাপদ ভেবে একটা লোক পাঠিয়ে দিল। কে এসে খবর দিল পিওনটা বেরিয়ে পড়েছে। বসেই থাকত বাড়িতে, ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট একজন ছেলে পাঠিয়ে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন। এ্যামেচার ক্লাবের সমস্যা তো মিটেও মেটে না। এর পর নিরাপদ না হলেও, ফিরে এসে তুলতেই হোল কথাটা—"পার্সেলটা এসেছিল আজ?"

"আজ? কৈ, না তো!"—বেশ সহজ কণ্ঠেই সত্য কথাটা বলল নীরা। বেশ সহজ কণ্ঠে প্রশ্নও করল—"কিসের পার্সেল গা? তুমি যেন কাল থেকে বড় ভাবনায় রয়েছ।"

"ছাখো না! একজন মেডেল দেবে, তা আমার ঘাড়ে ভার দিয়েছেন। আজও এল না, এমন ভাবনায় পড়া গেছে!"

"লোকটা কে? মেডেলটা দিচ্ছে কাকে?"

"দিচ্ছে, ঐ যে তনু বলে মেয়েটি, তাকে। নাম প্রকাশ করতে চায় না নিজের।"

"ভীতু!"—বেশ একটু তিরস্কারের টোনেই বলল নীরা; "বাঃ, আমার যাকে পছন্দ তাকেই দোব। এতে ভয় করবার কি আছে কাউকে!"

—টেবিলে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মুখ নীচু করে বসেছিল নীরা। কানে কি রকম একটু লাগতে মৃগেন চেয়ে ছাখে, মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর, হাসলে ওর গালে যে টোলটুকু খায়, ওটা তাই নাকি?

"যাই, কাজ প'ড়ে আছে অনেক"—ব'লে তখুনি তাড়াতাড়ি মুখ

ফিরিয়েই চলে যেতে সন্দেহটা বেড়েই গেলে মৃগেনের।

তবে রইল না বেশিক্ষণ। সেই রাত্রেই প্রেসিডেন্ট স্টেজ থেকে অন্যান্য মেডেলের কথা জানাবার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন—একজন অজ্ঞাতনামা মহিলা শ্রীমান তপেশ দত্তকে তাঁর বীররস অভিনয়ের জন্য একটি সোনার পাতের বেষ্টনী দেওয়া রূপার মেডেল উপহার দিয়েছেন।

তবু যেটুকু সন্দেহ লেগেছিল, এগিয়ে গিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করেও নিল মৃগেন।

বিনিদ্র রাত্রির পর সমস্ত দিনটা এক রকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে দু'জনে। একটু একসঙ্গে হোল সন্ধ্যার পর। মৃগেন টেবিলে একটা ডাক্তারি মাসিকের পাতা ওলটাচ্ছে অলসভাবে, নীরা একটা সেলাই নিয়ে বসেছে শোফায়। চাকরটা এই মাত্র চা দিয়ে গেল।

পাতা ওলটাতে ওলটাতেই পাশে খুব দ্রুত একটা দৃষ্টি হেনে নিয়ে বলল—"ভদ্রমহিলা যাকে পছন্দ তাকে বরমাল্য দিয়েছেন, এতে নাম গোপন করবার কি আছে? তোমার কথা ধ'রে আমারও বলতে ইচ্ছে করছে—ভীতু! কাউয়ার্ড!"

সেলাই থেকে একটু চোখ তুলে চাইল নীরা। মুখে একটা সিগারেট চেপে আছে মৃগেন, তার সঙ্গে ওটা কি একটু হাসিও রয়েছে চেপে? তবে রাগ যে নেই এতে নিঃসন্দেহ নীরা। তিন-তিন বছর ঘর করে আর কিছু পারুক বা না-পারুক কৌতুক-চৈতন্য বা সেন্স অব্ হিউমারটা এনে দিতে পেরেছে স্বামীর মধ্যে। সেই ভরসাতেই একটু চুপ করে থেকে ওদিকে একটা ক্ষিপ্র দৃষ্টি হেনে নিয়ে বলল—"তা আর নয়? ভীতু—সে একশ'বার!"

তারপর আর একটু হেসে, আর একটা দৃষ্টি হেনে—

"কিন্তু একটা কথা—ভীতু হলেও ভদ্রমহিলা বীররসের পক্ষপাতী অন্ততঃ।"

মুখের অস্পষ্ট একটু হাসি ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবেই স্পষ্টতার দিকে এগুচ্ছে ; ওদিকে সিগারেটে চাপা হাসিটুকুও। একটু—আরও একটু, তারপর ঘর ফাটিয়ে ত্ব'জনে সমতানে উঠল হেসে।

হাসির দমকে নীরাকে তো ঘর ছেড়ে বারান্দায় ছুটেই বেরিয়ে যেতে হোল।

"লঙ্কাকাণ্ড"

এ যে দেখছি তীর্থে এসেও পরিত্রাণ নেই।

মনে করলাম বেরিয়ে পড়ি দিন কতকের জন্য ঝামেলার মধ্যে থেকে। ছিলামও দুটো দিন বেশ, কাল সন্ধ্যার পর থেকে উপদ্রবটা শুরু হয়েছে। একেবারে লঙ্কাকাণ্ড। না, মারামারি কাটাকাটি গৃহ-দাহ—সে ধরনের কিছু নয়। নিতান্ত ঘরোয়া আক্ষরিক অর্থেই লঙ্কাকাণ্ড। কর্তা লঙ্কার বিশেষ পক্ষপাতী, পাওয়া গেলে কাঁচা লঙ্কারই, গৃহিণী দু' চক্ষে দেখতে পারেন না, আজ কলহের মুখে বলে দিলেন—লঙ্কাখোরদেরও নয়।

অবশ্য একেবারে অতটা নয়; সেকথা পরে বলছি।

ধর্মশালাটা একটা চকমেলানো দোতালা বাড়ি। পাশাপাশি মাঝারি সাইজের ঘর, পেছনে দুটো করে জানালা, সামনে টানা বারান্দা। ওপরেই একটা ঘর নিয়েছি আমি। চৌকি, একখানা টেবিল, একটা চেয়ার আছে, দু' টাকা করে দিতে হয় তার জন্য পাঁচ-দিনের মেয়াদে, এজন্য বেশ নিরিবিলি। আমি যখন আসি তখন আমার ডানদিকের ঘরটায় রয়েছেন একজন বৃদ্ধা, তাঁর ছেলে, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, আর একটি নাতনী। আমি আসবার দু' দিন আগে এসেছেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবার। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েই এসেছিলেন, এখন একটু গুছিয়ে নিলেও মেয়েটির বিবাহের জন্য বিশেষ চিন্তিত। মন্দির থেকে আসবার পর ওদের সঙ্গেই সুখ-দুঃখের আলোচনা করে বেশ কাটছিল একটি শান্ত পরিবেশের মধ্যে।

তার পর এঁরা এলেন কাল সন্ধ্যার একটু আগে, আমি যখন ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। কর্তার বয়স বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন, গৃহিণীর প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, সঙ্গে একটি ছোকরা চাকর—প্রায় চৌদ্দ-পনরো বছরের।

ভালোই দেখে গেলাম তো। কর্তা তালা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলছেন—"বলরাম, আগে তাড়াতাড়ি বিছানাটা পেতে দে, গোছগাছ হবে'খন।···শুনছ গা ?—হাত-পা মেলে একটু জিরিয়ে নাও আগে।"

সিঁড়ির দু ধাপ নেমে গেছি, শুনলাম—"চুপ কর—কি বলবে লোকে ?—জিরুতেই এসেছি !"

—গৃহিণী চাপা গলায় একটু ধমকের সুরেই বললেন। সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপ থেকে শুনে বেরুলাম, কর্তা নিজের স্বাভাবিক গলায়ই উত্তর করলেন—"কে শুনবে সেই ভয় করি ; ভুগবে আমার হয়ে !"

·

আরতি দেখে একটু ঘুরেফিরে যখন ধর্মশালায় এলাম, উল্টো কাণ্ড একেবারে। নীচে থেকেই আমার ঘরের কাছে গোলমাল শুনে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি কর্তা-গিন্নীতে দারুণ বচসা লেগে গেছে। কর্তার কণ্ঠস্বরটা স্বভাবতই একটু রুক্ষ আর চড়া পর্দায় বাঁধা, বেরুবার সময় শান্তিপর্বেই টের পেয়েছিলাম সেটা, তবে গৃহিণীরও আর সেই চাপা ভাব নেই ; ফলে যুগ্মকণ্ঠস্বরে ওপরটা গমগম করছে। হাতেরও বিরাম নেই। অবশ্য সে ধরনের কিছু নয় ; দু' জনে বলরামের দুটো হাত দুদিকে ধ'রে টানাটানি করছেন, সে বেচারা ভ্যাবাচাকা খেয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে, ব্যাপার দেখে মনে হল দু-একটা চড়-চাপড়ও গিয়েছে তার ওপর দিয়ে। আমার ডান দিকের ঘরে তালা বন্ধ, তবে কিছু লোক জুটে গেছে নীচে থেকে। সিঁড়ির দরজার কাছেই আধা অন্ধকারে হতভম্ব হয়ে একটু দাঁড়িয়ে থেকে যেটুকু শুনলাম তাতে বোঝা গেল যে বিরোধের মূলে লঙ্কা বর্তমান।

লঙ্কার অনুপস্থিতি বলাই ঠিক। আসবার সময় গৃহিণী নারীসুলভ রদর্শিতার সঙ্গে পুঁটুলি-পাঁটুলিতে বেঁধে দু' সন্ধ্যার উপযোগী সবকিছু নিয়ে এসেছেন, চাল থেকে জিরে মৌরি পর্যন্ত, আনেন নি শুধু লঙ্কা। কর্তা বলছেন এ তাঁকে জব্দ করবার জন্যে, গিন্নী বলছেন ভুলে গেছেন।

কর্তা বলরামের হাতে একটা টাকা দিয়ে বাজার থেকে লঙ্কা কিনে আনবার জন্যে পাঠাচ্ছিলেন, গিন্নী তার হাতটা ধরে ফেললেন—অনেক কাজ আছে এখানে। তার পর থেকে এই দড়িটানা-যুদ্ধ চলেছে। দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পড়ব, গিন্নী চীৎকার করে উঠলেন—"তা যা, বাজারে যত লঙ্কা আছে কিনে আনবি, বলা! কাল গিয়ে যদি একটা লঙ্কা খুঁজে পাই তো তোরই একদিন, কি, আমারই একদিন। যা!"

ঝট্‌কা মেরে এমন জোরে ঠেলে দিলেন যে বলরাম কর্তার হাত ছাড়িয়ে সিঁড়ির ওপর ছিটকেই পড়ছিল, আমি ধরে ফেললাম। ওকে পাশে জড়িয়েই এগিয়ে এসে বললাম—"লঙ্কা দরকার তো আমার কাছে আছে কিছু। বাজার খানিকটা দূরে তো।"

—যেন এইমাত্র এসে ঐটুকু মাত্র শুনেছি।

গিন্নী ভেতরে চলে গিয়েছিলেন, "কিছুতে যদি হত···"—বলতে বলতে বেরিয়ে আসছিলেন, আমায় দেখে থেমে গেলেন। তবে খুব যে অপ্রস্তুত তাও নয়, যেন, যদি বলেই ফেলে কর্তার কীর্তি জাহির করে দিতেন তো তাতে অনুতাপের কিছু ছিল না। খুব ঘোমটা-টানা জাতীয় স্ত্রীলোক নয়।

কর্তা হঠাৎ আবার চটে উঠলেন; গিন্নীর ওপর নয়, বলরামের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন—"তুই এক পা বাড়া বাজারের দিকে, তোর হাড় একদিকে মাস একদিকে না করি তো বলিস আমায়।"

আমার একটা হাত ধরে একরকম টেনেই নিয়ে এলেন আমার ঘরের সামনে, বললেন—"চলুন ভেতরে, সব বলি, ঘরের কথা নিয়ে তো ঢাক পিটুতে পারি না সবার মতন। আপনি প্রবীণ ব্যক্তি, বিচার করে বলুন দোষটা কার।"

রাগে হাতটা কাঁপছে।

তালা খুলতে খুলতে বললাম—"আপনি ভেতরে এসে বসুন, তাতে মানা নেই, কিন্তু আমায় আর এর মধ্যে···"

"না, শুনুন আপনি,"—গিন্নীর গলা, ঘুরে দেখি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, বললেন—"শুনতেই হবে, আমিও আসছি হাতের কাজটুকু সেরে। আমি বাবা লঙ্কেশ্বর মহাদেবের কাছে একটা ফয়সালা করে যাব বলেই এসেছি। আপনি শুনুন কি বলতে চান উনি, তার পর আসছি আমি।"—চলে গেলেন ভেতরে।

ঘরে ঢুকেই কর্তা বলে উঠলেন—"এই যে কুকার রয়েছে আপনার!" সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে ও ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েই গলা বাড়িয়ে বলে দিলেন—"আমি এখানেই খাব, কুকার রয়েছে এনার!"

ভেতর থেকে কিছু মন্তব্য শোনা গেল না। ঘুরে এসে চৌকিতে বসে আরম্ভ করলেন—"উনি এখানে বাবার কাছে ফয়সালা করতে এসেছেন। আমি যদি এখন বলি—লঙ্কা ছাড়তে হয় তো আমি সব কিছু ছাড়ব, তা হলে অন্যায়টা হয় কোথায় আপনাকে একটু বিবেচনা করে বলতে হবে..."

—অর্থাৎ পত্নীত্যাগ। কথায় পূর্ব-বঙ্গের একটু টান, তার সঙ্গে সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে মনে হয়েছিল ওদিক থেকেই এসেছেন বুঝি, কিন্তু সব শুনে টের পাওয়া গেল তা নয়। হুগলী জেলারই মানুষ, চাকরি উপলক্ষে শেষের তের-চৌদ্দ বছর ওদিকেই ছিলেন, এবং তাইতেই অভ্যাসটা হয়েছে। বললেন—চান তো এক কথাতেই ছেড়ে দিতে পারেন, সে মনের জোর আছে, কিন্তু ছাড়বেন কেন? মদ নয়, গাঁজা নয়, গোটাকতক লঙ্কা; একজনের চোখ রাঙানিতেই অমনি ছেড়ে দিতে হবে?

"আপনি বিবাহিত?"—কথাগুলা ওঘর পর্যন্ত শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে বলতে হঠাৎ একটু গলাটা খাটো করে এবং ওদিকেও একটু চেয়ে নিয়ে প্রশ্নটা করলেন আমায়।

বললাম—"না, ও সৌভাগ্যে বঞ্চিত আছি।"

"বেঁচেছেন মশাই!!" হাত দুটো মাথার দু দিকে তুলে চোখ বড় বড় করে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। আর একবার বাইরের দিকে

চেয়ে নিয়ে বললেন—"সৌভাগ্য যে কী তা শর্মা হাড়ে হাড়ে বুঝছে।... আর, যদি তেমনি দুর্মতি হয় কখনও তো যেন দ্বিতীয় সংসার করতে যাবেন না—সে যে আবার কী সৌভাগ্য!..."

হঠাৎ ঘরে ছায়া ফেলে গিন্নী এসে প্রবেশ করলেন হনহন করে, এবং সোজা কোণের দিকে গিয়ে কুকারটা তুলে নিয়ে বললেন—"আমাদের ঘরেই খাবেন কাকাবাবু, আমরা বামুন। রয়েছি পাশেই যখন, মিছিমিছি হাত পোড়াতে যাবেন কেন?" চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"শুনুন দ্বিতীয় সংসারের ব্যাখ্যানা ততক্ষণ, আমিও আসছি।"

ভদ্রলোক বললেন—"দেখলেন তো?"

আর কিছু না বলে মুঠোয় গাল দুটো চেপে চুপ করে বসে রইলেন একটু; তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গিন্নী আর অবশ্য এলেন না—এবং বাকি রাতটুকু নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটল। খাওয়ার সময় গিন্নী কর্তার পাতের একপাশে দুটো কাঁচা লঙ্কা রেখে দিলেন। কর্তা নিঃশব্দে সে দুটো মুঠোয় কচলে মেঝেয় ফেলে দিলেন; পরে হাতটা বার দুই ধুয়ে নিয়ে খেতে বসলেন।

সকালে আবার ঐ ব্যাপার, শুধু যুদ্ধের রীতিটা বদলেছে।

একজনকে খেতে বলেছেন, ওরই মধ্যে সাধ্যমতো আয়োজন করেছিলেন গিন্নী, নিদ্রা যেতে রাত হয়ে গিয়েছিল। ঘুমিয়েই ছিলাম খানিকটা বেলা পর্যন্ত, হঠাৎ গলায় একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করে কাশতে কাশতে উঠে দেখি ওপর-নীচে সমস্ত ধর্মশালাটা কাশির দমকে ভেঙে পড়বার দাখিল। কাশতে কাশতেই কোন রকমে কপাট খুলে বেরিয়ে এসে দেখি ডান দিকের ঘরটায় তালাবন্ধ, বাঁয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে কর্তা আর বলরাম সমানে কেশে যাচ্ছে, ঘরের মুখে লঙ্কাপোড়ার তীব্র গন্ধ। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে সিঁড়ির দিকে পা চালিয়েছি,

কর্তা ঘুরে ছুটে গিয়ে সিঁড়ির দোর আটকে দাঁড়ালেন। কাশির ঝোঁকের মধ্যেই বললেন—শুনতে হবে আমায়। বিচার করতে হবে। কাশির ঝোঁকের ফাঁকে ফাঁকেই জানালাম—নীচে থেকে এসে শুনছি, কিন্তু কোন মতেই দোর ছাড়লেন না। আমি কাশতে কাশতে বোঝাবার চেষ্টা করছি, উনি মাথা নাড়তে নাড়তে কেশে যাচ্ছেন, এইভাবে আরও প্রায় মিনিট ত্নয়েক যাওয়ার পর আমার হাত ধরে বারান্দারই আরও খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত ইতিহাসটা বললেন। সবিস্তারেই মকদ্দমা সাজিয়ে বললেন, তার সংক্ষিপ্তসার—আজ একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে উনি নিজেই সকালে উঠে বাজার থেকে পো'টাক লঙ্কা কিনে এনে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবেন বলে আথায় আগুন দিয়ে একটু নীচে গেছেন, ঘরে এসে দেখেন সমস্ত লঙ্কা আগুনে, গিন্নী কাপড় গামছা আর তেলের শিশি নিয়ে নদীতে স্নান করতে হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছেন!

আহারে একাই বসতে হল। গিন্নী ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তা সেই যে বেরিয়ে গেছেন, বেলা হয়ে গেল, ফিরে আসবার নাম নেই। অপেক্ষাই করছিলাম, গিন্নী একেবারে ভাত বেড়ে রেখে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন। কোন মতেই শুনলেন না, বললেন—কর্তার জন্য ভাবনা নেই, ঠিক এসে হাজির হবেন, মাসের মধ্যে পনরো দিন এই রকম হচ্ছে। পেটের জ্বালা ধরলে আপনি সুড় সুড় করে এসে পড়েন। পাখা-হাতে বসে নিজের কাহিনী শুনিয়ে যেতে লাগলেন—

"আজ গুনে ঠিক আঠারো বছর এই তুর্ভোগ যাচ্ছে কাকাবাবু, আপনি বাপের তুল্যি, খেতে বসেছেন, মিছে কথা বলব না। আঠারো বচ্ছর এই ঘরে এসেছি তো। কাঁড়ি কাঁড়ি লঙ্কা, কাঁড়ি কাঁড়ি লঙ্কা! বলি হ্যাঁগা, কঠিন ব্যামোয় ধরবে যে, তা, সেখানে কি করে ছিলুম?… সেখানকার কথা এখানকার কথা এক? সে হল জোলো দেশ, আর তারা পুরুষানুক্রমে ঐ বিষ গিলে আসছে,তোমার সেই রকম শক্ত নাড়ি?"

বললাম—"একটু ঢিলে দিও মা, অব্যেসের ধাত তো, একেবারে বন্ধ করাটাও আবার ঠিক নয়।"

"ওমা, তা দিচ্ছি না কাকাবাবু? ছোট সংসার আমাদের—আমরা দুজন, আমার গণেশ, ননদের মেয়েটি, দিদি দুটি মেয়ে রেখে মারা গেলেন তো…"

শিউরে উঠলেন গিন্নী—"ওমা তারা আবার কী লঙ্কাখোর কাকাবাবু, বাপের ওপর টেক্কা দিয়ে যায়! বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে কি কাণ্ড করছে জানি নে। এখন আমাদের ঐ চারটির সংসারে দিন আটগণ্ডা করে লঙ্কা খরচ।"

আমি একটু চকিত হয়েই চাইলাম। উৎসাহ পেয়ে বললেন—"একটি কথা মিথ্যে বলছি না কাকাবাবু, আপনি সদ্ ব্রাহ্মণ, ভাতে বসেছেন। তা সেই যে অষ্ট গণ্ডার গল্প শুনেছেন হুবহু তাই একেবারে। তা হবে না কেন বলুন, ছেলেকে আর ভাগ্নীকে যে দলে টেনেছেন। তাও রোজ হুজ্জত করে এই দাঁড়িয়েছে—গণেশ আর মানুকে তো আমিও আস্তে আস্তে ভাঙিয়ে আনছি…গণেশ আমার বড় ভালো ছেলে কাকাবাবু, এইবার তিনটে পাশ দিলে, আশীর্বাদ করুন কাকাবাবু যেন মানুষ হয়…তা ঐ যে কমে এসেছে, এখন আবার জিদ ধরেছেন, সেই সাবেক চালে চলব আবার। তাইতেই তো এত কাণ্ড। তাইতেই তো টেনে নিয়ে এসেছি এখানে কাকাবাবু…"

হঠাৎ গলাটা নেমে আসায় মুখ তুলে চাইলাম। আর একটু নামিয়েই দিলেন, "আপনাকে বলব না তো কাকে বলব কাকাবাবু? মতলব করে টেনে নিয়ে এসেছিলাম ভুজুং ভাজুং দিয়ে, বাবা লঙ্কেশ্বরকে লঙ্কাটা দিয়েই দোয়াব। ব্যস, আর ছুঁতে পারবেন না, আপদের শান্তি। তা সেয়ানা কি রকম দেখলেন তো? উল্‌টে নিজে বাজারে গিয়ে মেপে এক পো লঙ্কা নিয়ে এসেছেন।" আবার গলার স্বরটা সহজ হয়ে এসেছে।—"তা আমিও তেমনি মেয়ে। আমার নাম ক্ষান্তমণি, অনেক সেয়ানার নাক কেটেছি—দেখলেন তো, লঙ্কার শোকে দেশছাড়া।… অবিশ্যি ভাববেন না—এখুনি ফিরে আসছেন—পুরুষ মানুষ, রাগ দেখাতেই আছেন—ক্ষিদে বরদাস্ত করবেন, সে ক্ষ্যামতা নেই।"

বললাম—"ঐ রকম আস্তে আস্তে কমিয়েই আনতে হবে মা, নইলে…"

"তাই-তো আনছিলাম কাকাবাবু, কিন্তু দেখলেন তো, আমার ওপর আক্রোশ করে লঙ্কার বাজার উঠিয়ে আনা! আমিও তেমনি ও পাটই চুকিয়ে দিয়ে এসেছি বাবা লঙ্কেশ্বরের কাছে দিব্যি করে। ও উৎপরীক্ষে লঙ্কার তরকারি আমি আর রাঁধতে পারব না।"

"দিব্যি করে এলে! তাহলে?"—আমি একটু বিস্মিত ভাবেই চেয়ে প্রশ্ন করলাম।

"কেন, শখ থাকে খাওয়ার তো বেটার বিয়ে দিন তেমনি লঙ্কাখোর মেয়ে দেখে—যত খুশি খান লঙ্কা, তখন তো…"

"হাঁ, খাইবই তো লঙ্কা। দিব বেটার বিয়া!"—ঘুরে দেখি কর্তাই, মনে হল দোরের পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেনই। ঢুকে চৌকীতে বসে পড়ে মাথা ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে বলতে লাগলেন—ওদিককার টানটাও একটু বেড়ে গেছে—"আজকাল আর অভাব নাই লঙ্কা রেঁধে দ্যাওনের লোকের, আমি ঠিক করেই আসছি, কারুর দাপট সইতে পারব না। আগেকার মতনই লঙ্কা খাব তবে ছাড়ব—আমার নাম…"

"হয়েছে, মস্ত বড় নামী বীরপুরুষ।" কর্তা আমার দিকে চেয়ে পরস্মৈপদে শাসিয়ে যাচ্ছিলেন, গিন্নী কথাটা বলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন; উঠে পড়ে বললেন—"এখন দয়া করে কিছু পেটে দিয়ে ঠাণ্ডা হন তো।"

* * *

মিছে বলেন নি, ঠিক করেই এসেছেন। আমার ডান দিকের ঘরের ওঁদের সঙ্গে। এখানে একটু মুখ চেনাচেনি হয়ে গিয়েছিল, মন্দিরে গিয়ে পরিচয় হয়, সেইখানেই পাকাপাকি করে ফেলেছেন। নিশ্চয় দলে পুষ্ট হওয়ার জন্যেই উৎসাহের মুখে ভাষার ঝোঁকটা ও ঐ

দিকেই চলে গেছে হঠাৎ। খাওয়া-দাওয়ার পর উঠে গিয়ে ডেকেও নিয়ে এলেন ওঁদের ; মেয়েটিকে সুদ্ধ। একটু শঙ্কিতই রইলাম, আবার বুঝি বাধল হ্যাঙ্গামা।

না, ওধার দিয়ে গেল না। ব্যাপারটা খুবই আকস্মিক, গিন্নী একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইলেন, মিনিটখানেক, তার পরই ওঁদের দুজনকে বসতে বলে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এলেন ঘরের ভেতর। অত বড় একটা কঠিন দিব্যি করে বসেছেন, তার একটা সদ্য সমাধানই তো।

তা ভিন্ন মেয়েটিও বড় মিষ্টি।